Banglapdf.net Presents

দোলো আমার কনক চাঁপা

আহমদ ছফা

ronio60007

প্রকাশনার পাঁচ দশকে
স্টুডেন্ট ওয়েজ

প্রকাশক
মোহাম্মদ লিয়াকতউল্লাহ
স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
দূরাভাষ : ৭১১ ৪০ ৩৬
ই-মেইল : studentways@hotmail.com

দ্বিতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
রবিউল আউয়াল ১৪২৩ হিজরী

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মামুন কায়সার

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

অক্ষর বিন্যাস
হৃদয় কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
ঢাকা ১০০০

মুদ্রণে
সালমানী প্রিন্টার্স
নয়াবাজার ঢাকা ১১০০

মূল্য : চল্লিশ টাকা

ISBN 984 406 098 2

DOLO AHAMAR KONOK CHAPA : A Collection of Short Stories by Ahmad Safa. Published by Mohammad Liaquatullah of Student Ways. 9, Bangla Bazar, Dhaka-1100. Second Edition : April Two Thousand Two. Price : Taka Forty Only.

উৎসর্গ

সত্যেন দা'কে—

সূ চী প ত্র

দোলো আমার কনক চাঁপা/ ৯
সোনা পুতুল/ ১২
ঘোড়া চুরির সাক্ষী/ ৩৩
দুটি মর্মর মূর্তির কাহিনী/ ৩৯
স্বপ্ন সমুদ্দুর/ ৫৪

গল্পগুলো কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও সর্বত্র কিশোরীয়ানা ঠিকমতো ফুটে ওঠেনি। এজন্য লেখকই দায়ী। লেখার ইচ্ছে এবং ক্ষমতা দু'টো এক জিনিস নয়। তাই রচনাগুলো যদি ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যকিছু হয়ে গিয়ে থাকে, তার জন্যে লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

গল্পগুলো বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে রচিত। কোনো কোনোটি কাগজে ছাপা হয়েছে। সে সুবাদে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। তাছাড়া গল্পগুলোয় নানা প্রিয়বন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত। তাদের কেউ চোখের সামনে আছে, কেউ নেই। বইটির প্রকাশনা কালে সকলকে আবার স্মরণ করছি।

আহমদ ছফা

দোলো আমার কনক চাঁপা

দুপুরে ইস্‌কুল থেকে এসে মার পাশে পাটিটার ওপর কাত হয়েছিলো। তার চোখে কেমন করে ঘুম নেমে এসেছিলো। বেশ ঘুমিয়েছে আশু। এখন ঘুমটা পাতলা হয়ে এসেছে। চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না খালি। আধ ঘুমোনো অবস্থায় আশুর কানে এলো গানের সুর। মিষ্টি মিষ্টি। রেশটা মাকড়সার জালের মতো বুকের ভেতর ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতে চোখ কচলে একবার তাকালো। কালো কালো ছোটো ছোটো টানা টানা পিটপিটে দু'টো চোখ আশুর। একবার মাত্র তাকিয়ে বন্ধ করলো। আবার মেললো। ডান চোখের কোণায় পিচুটি জমেছে। মুছে নিলো।

মা সেলাই করছে। বেড়ার ফুটো দিয়ে তিনটে আলোর রেখা তেরছা হয়ে ঘরের ভেতর নেমেছে। একটি পড়েছে মার হাতে। সাদা সুঁইটা ঝক ঝক করছে। ঝুঁকে পড়ে সেলাই করে যখন মা, সে সোনা আলোর রেখাটি কপালে নাচে। কপালের বাঁ দিকটা গোল একটি সোনার টাকার মতো জ্বল জ্বল করে। মার মুখখানি বড়ো মলিন। কুচুর কুচুর কাঁথা সেলাই করছে। দু'খানি ঠোঁট নড়ছে মার। চেকন সুরের গান ঝরছে মার মুখে। আশুর বেশ লাগে। মার মিহি সুরের গানে তাদের 'হাথনে' ঘরখানা সরু সরু আলোক লতার বন হয়ে গেছে যেনো। মা গাইছেঃ

'কেমনে পর হৈলিরে মা বাপ
দূর বিদেশে দিয়া,
মনের জ্বালা মিটারে মা বাপ
একবার নাইয়র নিয়া।

মার নথটার পাশ দিয়ে দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়েছে। আশুর মা নাইয়র যাবার জন্যে কাঁদছে। পাড়ার সকলে নাইয়র যায়। মার বাড়ী, খালার বাড়ী, বোনের বাড়ী। আশুর মার মা নেই, বোন নেই, খালা ফুফু কেউ নেই। বড়ো এতিম আশুর মা। নাইয়র নেয়ার কেউ নেই। ঘরে বা-জান না থাকলে ঝাপ

দুয়ারে হেলান দিয়ে গুন গুনিয়ে গান গায় মা। আর চোখ দিয়ে টসটসিয়ে পানি ঝরায়। মার চোখের পানির ফোটাগুলোর মতো সুন্দর আর কিছু নেই। আশুর মার মনে দুঃখ, বড়ো দুঃখ। কাউকে বলতে পারে না। তার বা-জানকেও না। তাই কাঁদে মা। মাকে কাঁদতে দেখলে আশুর নরোম মনটা জানি কেমন করে। তার বুকের ভিতরেও কে যেনো কেঁদে যায়।

আশু বিছানা থেকে উঠে মার পাশে গিয়ে বসলো। মা সেলাই করছে। লাল সূতোটি জ্যান্ত সুতোনলী সাপের মতো। মার হাতের টান লেগে বার বার

কাঁপছে। সুঁইটা কাঁথার ভেতর কুট্ করে একবার ডুবছে, একবার ভেসে উঠছে। লাল সুতোর মতো মার বুকের দুঃখ চেকন হয়ে, লম্বা হয়ে গুন গুনানো গানের মিহি সরু সুর হয়ে যায়।

আশু মা'র পিঠে একখানা হাত রেখে বলে। মা সে গানটি গাওনা। কোনটিরে আশু?--মা জিগগেস করে—যখন ছোটো ছিলে, নানার জন্য মগবিলে ভাত নিয়ে যেতে। নানা বলদ গরুর পিঠে হুঁকো রেখে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তো। আর গান গাইতো। মা বললো-- সে অনেক দিনের কথারে আশু। তখনো আমার বিয়ে হয়নি। সেবার আমাকে একটা বড়ইফুলী নথ গড়িয়ে দিয়েছিলো মা।

আশু বললো-মা তোমার পরস্তাব ছাড়ো। সে কথা অনেক বার বলেছো। তারপর তুমি গরুর পায়ে তোমার বাবার লাঙ্গলের ফাল বিঁধিয়ে দেয়ার গল্পটি বলতে শুরু করবে। সে সব অনেক বার শুনেছি। গানটি গাও। মা বললো,-- সে সব কি আর মনে আছে? কতোদিন হলো। বুবুর বিয়ের কথাবার্তা চলছে। যতীন বারেষ্টার বিলাত থেকে আগুনের নাহান মেম নিয়ে দেশে এসেছে। লাল মরিচের বরণ রঙ। যতীন বারেষ্টারের মা তো ভেবে কুল পায় না। বিলাতের বিলাতী মেম কোথায় রাখবে? কি খাওয়াবে? ওমা, সে মেমসাহেব রাঙ্গা হাত দু'খান বারেষ্টারের মার পায়ে ঠেকিয়ে ধূলো নিলো। মাইনসে বললো ধন্য বারেষ্টার... ধন্য মেম সা'ব। সে কতোদিন আগের কথা। মা ফোঁস করে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। আবার বলতে লাগলো। যে করিম বকসু গায়েন গানটা, বেঁধেছিলো, সে-ও মরেছে কতদিন আগে। যতীন বারেষ্টারের কথা শুনতে শুনতে আশুর মনটা বড়ো উদাস হয়ে যায়। কতোবার শুনেছে তবু শুনতে ইচ্ছে করে। মা গুন গুনিয়ে গানটা ধরে।

'দেশের মানুষ শুনছনি খবর
বিলাতের থুন মেম লই আস্যে
যতীন বারেষ্টার।'

অর্ধেক গেয়ে মা গানটা বন্ধ করলো। আশু শুধোলো, মা থামলে কেনো? মা বললো, আশু আমার অনেক কাজরে। কাঁথা সেলাই সেরে দু-সতীনের পুকুর পাড়ে গিয়ে কলাকচি শাক তুলতে হবে। আশুর মনে পড়লো। সে ঘুমের ভেতর একখানা আজব স্বপ্ন দেখেছে। বললো, মা মা শোন। আজ একখানা স্বপ্ন দেখেছি। মা তুমি কাঁদছো। নথের পাশ দিয়ে তোমার চোখের পানি ঝরছে ফোটায় ফোটায়। একেক ফোটা পানি একেকটা লাল ফুল হয়ে ফুটে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো ফুল। রঙ কেমন? সুরখ লাল। তাকানো যায় না। চোখ ধরে টানে। তোমার চোখের কতো পানি ঝরলো। আর কতো ফুল

ফুটলো। চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে দেখলাম আমি। হঠাৎ বাতাস এসে সব ফুলগুলো দুলিয়ে দিলো। ওরা মাথা নেড়ে দুলতে লাগলো কি সুন্দর! ঘুমটা ভেঙ্গে গেলো। জেগে দেখি মা তুমি কাঁদছো। ঠিক ঠিক। -- ও কিছুনা আশু, স্বপ্নে লোকে কতোকিছু দেখে। জীন-পরী, দৈত্য-দানো। আশু বলে, জানো মা পরশু দিন কি দেখেছি? আমি ইস্‌কুলে গেছি। মাবুদ মিয়ার ছেলে আনিস আমার ছেঁড়া জামাটা আরো ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমি মাষ্টার সাহেবকে নালিশ করলাম। মাষ্টার সাহেব আনিসকে কিছু বললো না। ছুটির পর আনিস আমার গোটা জামাটাই ছিঁড়ে দিলো। আমি কেঁদে উঠলাম।

হ্যাঁরে আশু পরশুরাতে তুই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলি। জিগগেস করলাম, কি? কি? নেড়ে চেড়ে দেখি ঘুমাচ্ছিস বেঘোরে। জীন পরীরা পোলাপানদের স্বপ্নের মধ্যে কাঁদায়। লুতা মোল্লাকে দেখলে বলিস আমি ডেকেছি। চালের জালি লাউটা দিয়ে একটা তাবিজ নেবো। মা তাবিজ দিলে কিছু হবে না। স্বপ্নে না হয় না দেখলাম। কিন্তু আনিস তো ইস্‌কুলে সত্যি সত্যি আমার জামা ছিঁড়ে দেয়। বই ফেলে দেয়--বললো আশু। মা চুপ করে থেকে বললো, জ্বীনেরা হাড়ে হাড়ে হারামজাদা। নানান বেশ ধরে এসে পোলাপানরে কাঁদায়। আশু মানতে চাইলো না। আচ্ছা মা আজ এমন লাল লাল ফুল দেখলাম কেনো? মা বললো, বুঝলিনা আশু আজকের স্বপ্ন খানা দেখিয়েছে ফেরেশতারা। আশুর মার কথা বিশ্বেস করে না। বলে, ফেরেশতারা তোমাকে কাঁদালো কেনো মা?

মা বিরক্ত হয়ে বললো, আশু আর জ্বালাসনে। আমার অনেক কাজ। তোর হাজার সওয়ালের জবাব দিতে পারবো না। আস্তে কথা'ক ফুলমনির ঘুম ভেঙ্গে যাবে।

সত্যি সত্যি ফুলমনির ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ভাঙ্গা দোলনার ভেতর ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদে। লালচে লালচে পা দুখানি আছড়ে আছড়ে কাঁদে। ফুলমনির পা দুটি ছিরাম কলার থোড়ের মতো। ছোটো আর লাল। মুখখানা হা করে ওঁয়া ওঁয়া কাঁদে। মা বিরক্ত হয়ে বললো। পোড়ারমুখীর জ্বালায় আর বাঁচলাম না। কোন কাজ করতে দেবে না। যাতো আশু, দড়িটা ধরে আস্তে আস্তে একটু দোলা। আমি এটুক সেলাই করে ফেলি।

ফুলমনি ছোটো পা দু'খানা আছড়ায়। আশু সরু দড়িখানা ধরে দোলায় ধীরে ধীরে। পুরোনো দোলনা আওয়াজ করে মচ মচ। ঘরের ফুলকাটা সাজি মাচার সঙ্গে ঝুলোনো দড়ি কেরেত কেরেত করে। আশুর ভয় হয়। এই বুঝি দোলনাটা ভেঙ্গে গেলো। দোলনা দোলায় আশু। আর গান গায়,

'না কান্দিও দুধের বাছা না ভাঙ্গিও গলা
কাইল বিহানে কিন্যা দেমু সোনার কণ্ঠ মালা।'

সোনার কণ্ঠমালার লোভে শান্ত হওয়ার মেয়ে ফুলমনি নয়। সে ওঁয়া ওঁয়া করে কেবল কাঁদে। কেঁদে কেঁদে মুখে ফেনা এসে গেছে। আশুর মাথায় চট করে একটা বুদ্ধি খেলে। সে মেজো আঙ্গুলটা ফুলমনির মুখের ভেতর পুরে দিয়ে বলে, নে এটা চোষ। ফুলমনি চুক চুক করে চোষে। তার নীচের চোয়ালে দু'খানা দাঁত গজিয়েছে। আঙ্গুলটা কামড়ে দেয়। নতুন দাঁত কিনা, দাগ বসেনা। ফুলমনির মাড়ি দু'টো বেশ তুলতুলে। আশুর ভালো লাগে, মেজো আঙ্গুল বের করে পাশের আঙ্গুলটা ঢুকিয়ে দিয়ে বলে ওটাতে আর দুধ নেই। এখন এটা খা। সেটা আর মুখে নেয় না ফুলমনি। আবার কাঁদতে থাকে। আশু দোলালে থামে না। গান গাইলে শোনেনা। মাকে ডেকে বললো। মা তোমার মেয়েকে তুমি নাও। আমার কাছে আর থাকে না। ছোটো হলে কি হবে। মাথাতে বেশ বুদ্ধি। আঙ্গুলে দুধ থাকে না বুঝতে পারে। মা বললো, ওটি আমার দুশমন।

তারপরে সুঁইটা খোপার ভেতর গুঁজে রাখলো মা। মার মাথায় অনেক চুল, বেশ লম্বা। এক সময়ে কালো ছিলো। খোপাটাও বেশ বড়ো আর গোল ছিলো। কদমফুলের মতো। খোপার নীচ দিয়ে লাল সূতোটা এলিয়ে পড়লো পিঠের উপর। ফুলমনিকে দোলনা থেকে কোলে তুলে নিতে গিয়ে বললো, ইস্ মুতে একেবারে জবজবে করে ফেলেছে। ভাটি বেলা কাঁথা বালিশ শুকাই কেমন করে? ফুলমনি মার বুকের দুধ খায়। চুক চুক করে আওয়াজ হয়। তার সারা গা'খানা চাকাচাকা দাগে ভরে গেছে। মা আলতো হাতে চাকাগুলো ধরে ধরে দেখে। আশু বলে, দেখো, দেখো, মা ফুলমনির গা'খানা কেমন লাল আর চাকাচাকা হয়ে গেছে। মা বলে--কচু আর মূলা খাওয়াতে সারা গা'খানা ভরে ' ছোকনা' উঠেছে। এখনো কাঁচা। পাকবে যখন কেঁদে কেঁদে সারা পাড়া মাথা করবে। আশু আফশোষ করে। মা তুমি কেনো খেলে কচু আর মূলা। সুন্দর গা'খানা পুঁতি জামের মতো 'ছোকনাতে' ভরে গেছে। মা সুঁইয়ে সূতো পরাতে পরাতে বললো। আশু তোর জ্বালায় বাঁচিনারে! কচু আর মূলা খাই মনের সুখে! তোর বাপের কয় হাজার পুকুর দীঘি আছে যে দু'বেলা কই, শিঙি মাছের ঝোল খাবো। আর বেশী কথা বলিস না। এখন ফুলমনি ঘুমোবে। চোখ দু'টো ছোটো হয়ে এলো। তোর লুঙ্গীখানা বড়ই গাছে চড়ে এফাড় ওফাড় ফেড়ে ফেলেছিস। সেলাই করতে গোটা দিন লাগবে।

আশু বললো, মা ও লুঙ্গী তোমার সেলাই করা লাগবেনা। ও আমি পরবো না। মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। তা'হলে পরবিটা কি শুনি? বাপের তালুক মুলুক কোথায় যে প্রতি মাসে তোকে নতুন লুঙ্গী কিনে দেবে? মার কথাটা বুকে লাগলো। আশু রাগ করেছে, আশু অভিমান করেছে। ঠোঁট দু'খানা ফুলিয়ে বললো, আমি ন্যাংটা থাকবো। কিছু পরবো না। মা বলে, শরম করবেনা?

মাবুদ মিয়ার ছাউয়াল আনিস সেলাইয়ের জোড়ায় জোড়ায় হাত দিয়ে ইস্‌কুলের ছেলেদের ডেকে যখন বলে, দেখ দেখ তোরা আশুর কাপড়ে কতো তালি, তখন বুঝি আমার শরম করে না?

মা কিছু বলে না। সেলাই থামিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। ফুলমনি দোলনায় শুয়ে হাসে। লাউ ফুলের মতো সাদা দু-খানা দাঁত দেখিয়ে কতো যে ভঙ্গী করে। আপন মনে হাত পা ছুঁড়ে, খেলা করে। একখানা হাত মুঠি করে চুষে। দা দা দা, নানা না কতো কি যে বলে। একবার এপাশ ফিরে একবার ওপাশ। আশুর কতো খুশী যে লাগে। দু'দিন বাদে ফুলমনিটা হাঁটা শিখবে। কথা বলবে। আশু রাগ অভিমান সব ভুলে গেলো। মাকে বললো। মা ফুলমনির দোলনাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

মা বললো। ভাঙ্গবেনা? সে কি আজকালের দোলনা, ও দোলনায় তোর পাঁচটি ভাই তিনজন বোন দুলেছে। তুই দুলেছিস। সকলে আমাকে কাঁদিয়ে চলে গেলো। আমার বাছারা সকলে ঐখানে ঘুমিয়ে আছে, ওই ছাতিম গাছের ছায়ায়। কবরস্থানের ছায়াবহুল ছাতিম গাছটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে ধরলো মা। চোখ ফেটে ঝরঝর করে ক'ফোটা পানি বেরিয়ে এলো। আঁচলের খুটে চোখ মুছে বললো। আটটি ভাই বোন মরার পরে তুই এসেছিস আশু আমার কোলে। কতো পীরের দরগায় গিয়েছি। ফকিরের তাবিজ নিয়েছি। পানি পড়া খেয়েছি। তারপর বুড়ো বয়সে তোকে পেয়েছি। আশুকে মা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। মাকে পাগলীর মতো দেখায়। আধপাকা চুলের খোপাটি খুলে গেছে। ছল ছল চোখে ছাতিম গাছটির দিকে চেয়ে থাকে। মা বুঝি তার আটজন ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে আছে।

মার জন্য আশুর বড়ো মমতা হয়। আশুর মা বড়ো দুঃখিনী। মার কপালে তেরছা আলোক রেখাটি পড়েছে। আশুর মনে হয়, মার মুখে সাত শো মানিক জ্বলছে। একতাল সোনার মতো মুখখানা। দেখে দেখে আশ মেটেনা। কত গভীর! কতোসুন্দর মার মুখখানি, কতো দুঃখ যে মুখে রেখা টেনেছে! বাঁকা বাঁকা সব রেখা। আশুর মাকে বইয়ের রাজরাণীর মতো লাগে। হাতে হীরারকাঁকন না থাকুক। মার পরনে না থাকুক ময়ুর কণ্ঠী শাড়ী। না দোলুক কণ্ঠে গজমোতির মালা। রিন রিন করে না বাজুক হাতে খাঁটী সোনার বালা। তবু, তবু, আগুন বরণ রূপের মা তার রাজরানী। হাঁ রাজরানী না হয়ে যায় না এমন মা। আর আশু নিজেও একজন রাজপুত্তুর।

খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে গেছে ফুলমনি। ছোটো পুতুলের মতো বোনটির জন্য আশুর খুব মায়া হয়। কতো সুন্দর বোনটি তার। একখানা ভাঙ্গা দোলনায় সারাদিন ঘুমায়। আমেনার ছোটো বোনটির দোলনা কেমন সুন্দর ফুলকাটা ফুলকাটা। ফুলমনিকে অমন একখানা দোলনায় দোলাতে শখ হলো

আশুর। মাকে বললো, মা বাজানকে বলো, ফুলমনির জন্য ছোটো দেখে, সুন্দর দেখে একখানা দোলনা যেনো কিনে আনে। বেপারীরা কতো রকমের দোলনা আনে। মেছোহাটার পাশে ঝুলিয়ে রাখে। মার আঁচল ধরে বললো আবদেরে গলায়, বলবে মা বাজানকে?

রোদের আঁচে মার করুণ মুখখানি আরও করুণ দেখায়। চোখ দুটো দিয়ে যেনো দুঃখ গলে গলে পড়ে। মাকে দূরের, অনেক দূরের মনে হয়। যেনো কেউ নয় আশুর। অতি কষ্টে বলে মা, আশু বুঝিসনা, তোর বাজানের কতো কষ্ট! মুখে চারটে ভাত তুলে দিতে গায়ের লহু পানি হয়ে যায়। কোত্থেকে তোর জন্য নতুন লুঙ্গী কিনবে। বোনের দোলনাও কিনবে কেমন করে। পয়সা কোথায়। দু'দিন বাদে ভাতও পাবি না যে খেতে। এবার মাবুদ মিয়া জমি বর্গা দেবে না। মার কথায় দুঃখে আশুর বুকখানা ভেঙ্গে যেতে লাগলো। শুধালো আশু, মা, বাজান কই গেছে। মা জবাব দিলো, গেছে মাবুদ মিয়ার বাড়ীতে। জমিটা আরেক সন আমাদের চাষে রাখার জন্য হাতে পায়ে ধরে বলবে।

আশু চাষার ছেলে। ছোটো হলেও তার বাজানের সুখ দুঃখ সব বুঝতে পারে। মাবুদ মিয়া জমি নিয়ে গেলে তার বাপের লাঙ্গল ফোটাবার মতো এক ছটাক জমি থাকবেনা... তখন কেমন হবে? ঘরে খাওয়ার ভাত থাকবেনা। মঙ্গলা গাইটিকে বেচে দিতে হবে! লাঙ্গলের ফালে মরচে ধরবে। জোয়ালটা লাকড়ি কাঠ হয়ে গোয়াল ঘরে পড়ে থাকবে। তার বাজান বিহান বেলা উঠে পরের বাড়ীতে কামলা খাটতে যাবে। যেদিন কাজ পাবে না সেদিন আশুরা সকলে মিলে উপোস দেবে। পানি এসে আশুর চোখের পাতা দু'টো ভিজিয়ে দেয়। হাতের উল্টো পিঠে চোখের পানি মুছে নিয়ে বললো, মা, মাবুদ মিয়ার বিল ভরা জমি; আমাদেরকে দুয়েক কানি দিয়ে দেয় না কেনো? আমাদের এতো কষ্ট কি বুঝে না! মা বললো, সকলের জমি কেড়ে নিয়েইতো মাবুদ মিয়া বড়ো লোক হয়েছে। একরামের বিধবা বৌটিকে তাড়িয়ে ভিটিটা কেমন করে দখল করে নিলো দেখিসনি। বড়ো লোকেরা কেনো যে গরীবের উপর জুলুম করে আশু বুঝতে পারে না। বসে বসে কতো কথা ভাবে। ছোট্টো আশুর ছোট্টো মনে কতো ভাবনা কাঁটার মতো এসে বিঁধে।

মা কাঁথাটি গুটিয়ে মাছার ওপর তুলে রাখলো। হাতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জায়নামাজটা মাটিতে পড়ে গেলো। মা বললো, আশু তোর দাদার জায়নামাজ। আশুর দাদার কথা মনে পড়লো। জায়নামাজের ওপর মাটির ঢিবির মতো বসে থাকতো। বয়সের ভারে মাথা তুলতে পারতো না। পাঁচ কুড়ি দশ বছর বয়সে মরেছে দাদা। কতো কষ্ট পেয়েছে। বাতাসে কান পাতালে আশু দাদার করুণ গোঙানী শুনতে পায় যেনো।

মা একটুকরো আঁখ বের করে দিলে সেটি চিবুতে চিবুতে আশু উঠান পেরিয়ে ঘাঁটায় এলো। কাঁধের গামছাখানা নাড়তে নাড়তে একজন লোক আসছে। আশু লোকটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। লোকটা জিগগেস করলো, এই ছেলে, আমেনার বাপের বাড়ী কোনটা? আশু ঢেউটিনের ঘরটা দেখিয়ে দিলো। লোকটা আবার জানতে চাইলো, রমিজ সওদাগরের বাড়ীর পথ কোন্‌দিকে। একটা ফুটফুটে ছেলে বললো, এই যে ইদিকে। রমিজ সওদাগর তোমার কে? ছেলেটি জবাবে বললো আব্বা। লোকটি গামছাতে কাঁধের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, তোমার আব্বাকে বলবে, পশ্চিম পাড়ায় রকিব মুন্সীর বাড়ীতে তোমাদের নিয়ে জেয়াফত খেতে যেতে। তারপর আমেনার বাপের বাড়ীর দিকে চলে গেলো। আশু তাকিয়ে রইলো। পাশের দু-বাড়ীতে মেজবানে যেতে বললো। আশুদেরকে বললো না। আশু অনেকদিন জেয়াফত খায়নি। মাংস ডাল আর সুরুয়া মাখা ভাতের খোশবু এসে নাকে লাগে। জিভ দিয়ে লালা বেরিয়ে আসে। মার কাছে এসে জিগগেস করে আশু। মা সওদাগরকে জেয়াফতে যেতে বললো। আমেনার বাপকে বললো, আমাদের বললো না কেনো? মা মুখকালো করে বললো। আমাদেরকে বলবে না বাবা! কেনো মা? কি করেছি আমরা? মা বললো, বাবা আমরা যে গরীব। গরীবদেরকে কেউ খানা মেজবানীতে ডাকে না।

বেতের ছোটো ঝুড়িটা হাতে বেরিয়ে গেলো মা। কথাগুলো আশুর কানে বাজতে থাকলো। মনে মনে বলে, আমরা গরীব! বড়ো গরীব! উচ্ছোলতার মাচানে যে কুটুম ডাকা হলদে পাখীটা লেজ ঝুলিয়ে বসে আছে, যেনো আশুকে ডেকে বলছে আশু তোমরা বড়ো গরীব। বিকেল বেলার ঝিরি ঝিরি হাওয়াতে যেনো একই কথা বলছে; আশু তোমরা বড়োই গরীব।

ঘাটা বেয়ে আশু আমেনার বাপের গোয়াল ঘরটা পেরিয়ে শোনালু তলায় এলো। শোনালু ফুলের ঝরা পাপড়িতে শোনালু তলা ভরে গেছে। আমিনার বোন জেরীনা হাসু জোলেখা সবাই বসে আছে। কথা বলছে ফিসফাস। আশুকে দেখতে পেয়ে জেরীনা বললো, বর হবিরে আশু। দেখ কানে শোনালু ফুলের মাকড়ি পড়ে কেমন সুন্দুর বউ হয়েছে জোলেখা। ডুরে শাড়ীর ঘোমটা তুলে জোলেখার মুখ দেখালো। কানের কাছে মুখ এনে বললো জেরীনা। এমন মেয়ে আর হয়নারে আশু। তুই বর হ। আমি শাউরী। নে কাঁঠাল পাতার টুপিটা পরেনে। আমি হাছামিছা মোল্লা ডেকে আনি বিয়ে পড়াবে। পয়লা খুশী হয়েছিলো আশু। মার কথাটা মনে পড়লো। আমরা যে গরীব। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। জেরীনাকে ডেকে বললো, আমি বর হবোনারে জেরীনা, চলে এলো আশু। কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবার সময় ছাতিম গাছটির দিকে তাকায়। গাছটির তলায় কবরের ভেতর তার ভাই বোনেরা ঘুমিয়ে আছে।

আস্তে আস্তে হাঁটে। মনে মনে ভাবে। কোনদিন যদি ঘুম থেকে তার ভাই বোনেরা জেগে ওঠে! যদি কোনোদিন ঘুম ভাঙ্গে! আহা যদি ভাঙ্গে! কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে দু-সতীনের পুকুর পাড়ে আসে। তার মা আর আতুর মাকে দেখতে পায়। ঝাঁকরা একটা কঞ্চি দিয়ে বেত ঝোপের ভেতর থেকে কলা-কচিশাক টানছে। সবুজ লকলকে কলাকচির কচি ডগাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুড়ির ভেতর রাখছে। আতুর মা তার মার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললো। ও রহিমা বু দেখ, দেখ তোর আশু কেমন করে হেলেদুঁলে হেঁটে আসছে। মা ডেকে বললো। দূরে টুরে কোথাও যাসনে। আশু বললো আচ্ছা।

বিলে এসে নামলো। ঝুমকোর মতো মরিচ। পেকে লাল হয়ে আছে। আশুর মরিচ কন্যার গল্পটি মনে পড়লো। মনে মনে আওড়ালো। মরিচ কন্যা, মরিচ কন্যা তুমি কেমন আছো। কোন রাজ কন্যার টুকটুকে রঙ চুরি করে লাল হয়ে যায় ক্ষেতের সব মরিচ। কলাই গাছে হলুদ হলুদ ফুল ফুটেছে। বিচিত্ররঙ্গা একটা প্রজাপতি আশুর মাথার ওপর দিয়ে উড়ছে। প্রজাপতির বিচিত্র পাখা দুখানা দেখে আশুর কাজী বাড়ীর রাঙ্গা লাজুক বউটির হলুদ বরণ শাড়ী খানার কথা মনে পড়লো।

আজ আশুর মনটা ভালো না। কে যেনো কানে কানে বলছে। আশু তোমরা বড়ো গরীব। গরীবরা বড়ো দুঃখী। ইচ্ছেমতো একখানা লুঙ্গী কিনতে পারে না। তাদের বোনেরা দোলনায় দুলতে পারে না। তাদের একটু ও জায়গা জমি থাকে না। কেউ খানা মেজবানে ডাকে না। সে নদীর পাড়ে এলো। নদী চওড়া। নদী কালো, নদী গভীর বুকের ভেতর আসমানখান বেঁধে রেখেছে। রাঙ্গা পালের একখানা নাও ধীরে ধীরে যাচ্ছে। বৈঠা ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ দিচ্ছে। ভেতরে দু'জন নাইয়রী মেয়ে। ওপাড়ের ছেলে মেয়েরা চী ৎকার করে ছড়া কাটছে।

অ নাইয়রী অ নাইয়রী
আমাগো বাড়ীত আইয়ো
ব্যাঙ খোলা আর ভাত দেমু ছিঁড়্যা ছিঁড়্যা খাইয়ো।

বালুচর পেরিয়ে নদীর জলে হাত ডোবায়। জলে মৃদু মিঠে স্রোত। জল ঠান্ডা শীতল। আশুর অর্ধেক দুঃখ শুঁষে নিলো যেনো। একটা শুশুক মাছ কালো জলের অতল থেকে ভুস করে ভেসে উঠলো। বাদামী শরীর, সুর্যের আলো লেগে চিক চিকিয়ে উঠলো। মাছটা লেজখানা দিয়ে জলে দু-বার ঝাপটা দিলো। বড়ো ভালো। যেনো আশুর দুঃখ বুঝতে পারে। ডিগবাজী খেয়ে আবার পানির অতলে কোথায় হারিয়ে গেলো। বংশী জেলে ছিপের

আগাটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে লোভ লাগানো বড়শি ফেলেছে। কালো চোখ মেলে ফাৎনার দিকে চেয়ে আছে।বংশীকে এক ঠেঙ্গে বগার মতো লাগে। বৈলতলীর ঘাটে তিনখানা নাওয়ে তামাক বোঝাই হচ্ছে, বাতাসে কটকটে ঘ্রাণ। আশু সইতে পারে না। বমি আসে। নদীর জলে সোনা মাখিয়ে সুর্যটা ডুবছে।

বালুচর বেয়ে আশু নাপিত পাড়ায় এলো। রজনী নাপিতের ভাঙ্গা মেটে কোঠাটির দিকে একবার তাকালো। গেলো বছর লেংড়া সাতাই মাকে ফেলে রজনীরা হিন্দুস্থান চলে গেছে। নারকোল গাছে ঝুলছে এক থোকা সবুজ ডাব। সবুজ ডাবে পড়ন্ত রোদ লেগেছে, শাখার চিরল পাতাগুলো কাঁপছে। নারকোলের কাঁপা কাঁপা পাতাগুলো দেখলে নাপিত-বউয়ের শাড়ী খানার কথা মনে পড়ে। বেড়ার আগায় দুলতো। একটা গরুর গাড়ী এলো, ফরেষ্ট অফিসের দিক থেকে আশুর পাশ দিয়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে চলে গেলো। একরাশ ধুসর ধুলো ওড়ালো। সাদা শিঙ্গাল বলদ দুটোর গলার ঘন্টা ধ্বনি অনেক দুরে ভেসে যায়। রেলের লাইন বেয়ে ঝকঝকে রূপার পাতের মতো গাড়ীখানা আসে। ঝিক ঝিক আওয়াজ। বিশাল আকাশটা আশুর মার মুখের মতোই মলিন। একটু পরে সাঁঝ নামবে।

আশু নাপিত পুকুরে গিয়ে বসলো। রজনী নাপিতের সাতাই মা-টা লেঙচে লেঙচে হেলেঞ্চা শাক তুলেছে। বুড়িটির কেউ নেই। আশুর মনটা ব্যাথায় ছেয়ে যায়, আহা, বুড়ীটির বড়ো দুঃখ। নাপিত পুকুরের পাড়ের কনক চাঁপা গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিরাট গাছ, অনেক পুরোনো। আগে নাপিত পাড়ার ছেলেরা গাছে চড়ে দুধা খেলা খেলতো, আশু মনে মনে দুধা খেলার বচনটি আওড়ালো;

দুধারে দুধা
দুধ কেন না দিস
বাঘের ডরে
বাঘে কি করে
মারে ধরে।"

কনক চাঁপা গাছটির তেলাল তেলাল ডাল, ঢাকুল ঢাকুল পাতা। প্রতি ডালের মাথায় থোকা থোকা ফুল। হলুদ হলুদ, সোনার ঝুমঝুমির নাহান। ভেতরে হলুদের ছটা। কোমল পরান জুড়ানো গন্ধ বাতাস ভিজিয়ে দেয়। আশু থোকা থোকা কনক চাঁপার ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে এতো হলুদ, এতো সুন্দর! এতো দোল খায়! ঢাকুল ঢাকুল পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে অন্ধকার আর ভেতর অনেক কথা,অনেক কথা-চুপ করে আছে। আশু ভাবে, গাছেরা কথা কইতে পারলে বেশ হতো। অনেক মজার কথা, সুন্দর কথা, আজব কথা বলতে পারতো। কতো বছর পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে

আছে। মেঘ বিষ্টি রোদ্দুরের কতো ছোঁয়া পেয়েছে। তার কি ভাষা নেই কোনো? আশুর মনে হয়, ওই আকাশে,গাছে, রোদদুরে, হেলেঞচা শাখার তাজা সবুজ ডগায়, বাবুই পাখীর ঝুলন্ত বাসায় কে যেনো সারাক্ষণ কথা কয়ে যায়। মানুষ না হয়ে যদি গাছ পালা হয়ে জন্মাতো সে ভাষা বুঝতে পারতো। আশু ভাবে আমি ফড়িঙ হলালম না কেনো। কেনো হলালম না কনক চাঁপার একটা হলুদ গুচ্ছ। হলুদ বরণ বুক ভিজে ভিজে গন্ধে থাকতো ভরে। কনক চাঁপা গাছটার সুড়ংটার পাশে একখানা সাপের খোলস দেখতে পেয়ে আশু ভয় পেলো। মনে পড়লো চারমাস আগে গোলাম শরীফকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলেছে। পায়ে পায়ে গাছটার গোড়া থেকে উঠে এলো।

বাজ পড়ে যে খেজুর গাছটার মাথা ভেঙ্গেছে, তার পাশে এসে বসলো। খেজুর গাছটা প্রতিরাত দু-ঘড়া করে রস দিতো। আশু মনে মনে চিন্তা করে উপকারী গাছগুলোর মাথায় কেনো বাজ পড়ে। ভূবন ডাক্তারের মতো ভালো মানুষেরা কেনো তাড়াতাড়ি মরে যায়। কেউ তার জবাব জানেনা। মাথা ভাঙ্গা খেজুর গাছের মাথায় শালিকটাও একই কথা ভাবছে যেনো। উপকারী গাছগুলোর মাথায় কোন বাজ পড়ে। মাথার ওপরে টেলিগিরাপের তারে নানা রকম শব্দ হয়। যেনো বলছে, আশু তোমরা গরীব। আশু কনক চাঁপার থোকা গুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। এতো হলুদ। এতো সুন্দর! আপন মনে দোল খাচ্ছে। আশুর মা নামাজে বসলে অমনি কনক চাঁপার গুচ্ছের মতো হয়ে যায়। কনক চাঁপার থোকার ভেতরেও আছে অনেক কথা। বাতাস এলে সর সর করে ঝরে পড়ে। কেনো সে ভাষা বুঝে না, আশুর দুঃখ হয়। ফুলেরা বড়ো ভালো। আর বড়োকোমল। দোষ কেবল তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। বাতাসের তোড়ে কনক চাঁপা দোলে, রাঙ্গা বউয়ের নোলক দোলে, দোলে আশুর মন। বিড় বিড় করে বলে, কনক চাপা দোলো। অমনি দুলে যায়। ভারী লক্ষী ভারী মিস্টি কনক চাঁপা। আশুর মনের কথা বুঝতে পারে। দুলতে বললে অমনি দুলে যায়, আর কেউ আশুর কথা শুনেনা। ছোট বোন ফুলমনি এখনো রক্তের দলা, কতো আদর করে, তবু কথা শোনেনা। কনক চাঁপার ফুল ছাড়া আশুর আর আপন কেউ নেই। আর কেউ আশুর মনের গোপন কথা বোঝেনা

মনেমনে একটা সত্য করলো। এবার যদি কনক চাঁপা দোলে, তা'হলে বোন ফুলমনির একখানা জাইয়ত বেতের ফুলকাটা দোলনা হবে। ফুলের থোকাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। একটু পরে বুক ঠান্ডা করা এক ঝলক বাতাস এসে থোকাগুলো দুলিয়ে দিলো। আশুর মনে খুশী ধরে না। আবার একটা সত্য করলো মনে মনে। আবার যদি দোলে কনক চাঁপা, আশুর এ খানা লুঙ্গী হবে, ফাল্গুন মাসের গায়ে হাত বুলোনো বাতাস এসে তাল পাতা ফুল সব

কিছুকে দুলিয়ে দিলো। আশু হাততালি দিয়ে বললো, কনক চাঁপা তুমি ঠিক ঠিক আমার বন্ধু। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তারপর মনে মনে আরেকটা সত্য করে। এবার যদি দোলে কনক চাঁপা, তাহলে বা-জানের চাষে তিন তিন কানি জমি আসবে। দুঃখ বলতে কিছু থাকবে না আশুদের সংসারে। কনক চাপাকে বলে দু'বার কথামতো দুলেছো, আরেকটি বারে দুলে দাও। আর তোমাদের ফুলের শরীরে কষ্ট দেবোনা, দুলতে তোমরা আনন্দ পাও। আবার কষ্টও পাও বটে। খুব কোমল তো তোমরা। আবার কোমল না হলে অমন রাজ কন্যের চরনের সোনার নুপুরে মতো দুলতেও পারে না। ঠিক আছে আরেকটি বার দোলো। আমি ঘরে চলে যাই।

আশু বসে থাকে। মনে মনে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাছের পোনার মতো খেলা করা বাতাসটিকে ডাকে। ও বাতাস তুমি তাড়াতাড়ি এসে কনক চাঁপার থোকাগুলো দুলিয়ে দাও। সাঁঝ হয়ে এলো। আমি ঘরে যাই। আমি ঘরে না থাকলে মা রান্নাবাড়া করতে পারবে না। সাঁঝের বেলা আমার কোলে চড়তে চড়তে ফুলমনিটার অভ্যেস হয়ে গেছে। নইলে পা আছড়ে আছড়ে কাঁদবে। বাতাস আসেনা। কনক চাঁপা এবার আশুর কথা শোনেনা। আশু কনক চাঁপাকে মিনতি করে, বোবা গাছ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। আশু বললো, আমি মনে মনে সত্য করেছি। তুমি দুললে বা-জানের চাষ তিন কানি জমি আসবে। তিন কানির ধানে সারা বছর আমাদের হয়ে যাবে। একটুও মিথ্যে বলিনি। আমার কথা মতো দু'বার দুলেছো। মাতাল বাতাস ইচ্ছের বিরুদ্ধে কতোবার তোমাকে দুলিয়ে দিয়েছে, ডাল ভেঙ্গে দিয়েছে। বাচ্চা ছেলের মিনতিটি রাখো। আরেকটিবার দোলো কনক চাঁপা, বা'জান আর মার মুখের দিকে চেয়ে। তুমি না দুললে তাদের দুঃখ যাবে না। যেইকে সেই। কনক চাঁপা দূললো না।

সাঁঝ হয়ে আসছে। আশু বসে থাকে। বারে বারে মিনতি করে। কথা শুনে না কনক চাঁপা। বলে, কনক চাঁপা, তুমি কোমল হলে কি হবে, তোমার মনটা বড়ো কঠিন। গরীব মানুষের দুঃখ বুঝোনা। গরীব মানুষের কি যে কষ্ট! গরীবরা খেতে পায়না। উপোস থাকে, তাদেরকে লোকে দাওয়াতে মেজবান ডাকেনা। আল্লাহ্ও তাদের দুঃখ বোঝে না। আমার কথাটি মনে রেখো। কালকে আবার আসবো। দয়া করে একটি বার দুলে দিয়ো কনক চাঁপা।

আশু চলে আসছিলো। একটা কানি বগ কোত্থেকে উড়ে এসে কনক চাঁপার ডালে বসলো। ডালটা নড়ে উঠলো। সে ডালের ফুলগুলো দুলে উঠে। পাতাগুলো মাথা নাড়ে। আশু দাঁতে ঠোট কামড়ে ধরে বলেঃ

কনক চাঁপা এইবার আসল ব্যাপার বুঝতে পেরেছি। এমনিতে তুমি দুলবে না তোমাকে ঝাঁকি দিয়ে দোলাতে হবে। লুঙ্গীটা শক্ত করে পরে নিলো।

তারপর গুঁড়ি বেয়ে গাছে চড়ে বসলো। বেশ কিছুদুর উঠে ডাল ধরে প্রচন্ড জোরে ঝাঁকি দিতে থাকে। কনক চাঁপার সে কি দুলুনি! ডালে মর মর করে তুফান ছুটেছে। আশু দু'হাতে ঝাঁকি দিচ্ছে। থামেনা, একটা ডাল মর মর করে ভেঙে ঝুপ করে পড়লো। এইবার আশু থামলো। নেমে এলো। কনক চাঁপা দুলে যাচ্ছে। চারদিক তরল আঁধার নেমে আসছে। আশু গর্বভরে বলে, কনক চাঁপা তোমাকে দুলিয়ে দিলাম। এবারে ফুলমনির দোলনা হবে। আমার লুঙ্গী হবে। বা-জানের চাষে তিন কানি জমি হবে। আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। তার বুকের ভেতর নরোম হলুদ সোনার বরণ কনক চাঁপা দুলে যাচ্ছে। এমন আনন্দ আশুর আর কোনদিন হয়নি। পায়ের সঙ্গে কি একটা খসখসে জিনিষ জড়িয়ে আছে, হাতে তুলে নিয়ে দেখে সাপের খোলস খানা। একটুকুও ভয় পেলোনা আশু। আকাশের বাগানে তারার ফুল ফুটতে শুরু করেছে। সেদিকে তাকিয়ে তার মরে যাওয়া ভাই বোনদের কথা মনে হলো। তারা বুঝি আকাশের তারা হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে। আশুর মন হু হু করে। ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

সোনা পুতুল

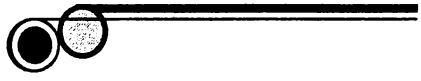

শাকুর সোনাপুতুলের বিয়ের কথা হচ্ছে। সে সুবাদে পাড়ার আর আর পুতুল-ছেলের মায়েরা তার সঙ্গে খাতির লাগাবার চেষ্টা করছে। ডলি, হাসিনা, বুলিকা, আরো ক'জন শাকুকে অনেক দিন থেকে খোশামোদ করছে। কিচ্ছু বলেনি শাকু। তারই মেয়ের বিয়ে। কি বলবে শাকু? হাঁ না কিচ্ছু বলেনি। মেয়ের মাকে কি চট করে কিচ্ছু বলতে আছে?

ডলিটা ভারীচালাক। শাকুর পেছন পেছন ঘোরে। আর মোচওয়ালা নেপালী দারোয়ানের মতোন পুতুলটাকে খেলনা মোটর গাড়ীতে বসিয়ে চাবি টিপে দেয়। ফট ফট আওয়াজ করে খেলনা মোটর বেশ কদ্দুর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। মোটর থেকে পুতুল কোলে তুলে নিয়ে মিছি মিছি গায়ের ঘাম মুছে দেয়। আদর করে। শাকুর দিকে ক'বার চোরা চোখে চেয়ে বলে, আমার বাহাদুর পুতুলটি বেশ ভালো না রে শাকু?'

শাকু জবাব না দিয়ে ডান হাতের কনে আঙ্গুলটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে ভাবে ডলির মতলব খানা কি? যদি বলে তোমার বাহাদুর পুতুলটা ভালো, অমনি ডলি বলবে, তাহলে শাকু আমার বাহাদুর পুতুলের সঙ্গে তোমার সোনা পুতুলের বিয়েটা দিয়ে দাও।

দু'চার দিন শাকুর আকাঁ-বুকির খাতায় একটা পদ্ম ফুল, একটা কচুপাতা আর একটা রেলগাড়ির ছবি একেঁ দিয়েছে। রেলগাড়ী কি-না চেনা যায়না। চাকা হয়নি, বগি হয়নি, ইঞ্জিন হয়নি। কালির কতোগুলো বাঁকাচোরা রেখা, তবু ওটাকে বলেছে ডলি রেলগাড়ী। তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই বলে ফেললো, শাকু আমার বাহাদুর পুতুলের সঙ্গে তোমার সোনাপুতুলের বিয়ে দিতে হবে। তা'হলে তোমার খাতায় রোজ রোজ ছবি একেঁ দেবো। ক্লাশে নামতা বলে দেবো। আরো কতো করে দেবো।

শাকু কিচ্ছু বলেনি। মেয়ের মা কিনা তাই। মেয়ের মাকে কিচ্ছুটি বলতে নেই। কিন্তু ডলির কথাটা ভালো লাগেনি। বললো, আমার সোনাপুতুলটা খুব ছোট্টো। তোমার বাহাদুর পুতুলটা একেবারে হাতীর মতোন ঢ্যাংগা।

কি বললি তুই? ডলি ক্ষেপে গিয়ে মুখ ভ্যাংচিয়ে বললো, ইস কি আমার ভারী-সোনাপুতুল রে–ওটা একটা ডাইনি। ওর সঙ্গে আমি দেবোই না আমার বাহাদুর পুতুলের বিয়ে। তারপর চিকন করে একটা চিমটি শাকুর বাহু মূলে বসিয়ে দিয়ে মটর গাড়ী আর হোঁতকা পুতুলটি নিয়ে পালিয়ে গেলো।

শাকুর শরীরটা একটু একটু জ্বালা করছিলো। মনটাও। অমন সুন্দর সোনাপুতুল তার। তাকে কি কেউ ডাইনি বলতে পারে! আদতে ডলির মনটা ভালো না! বিয়ে দেবে না বলতে মেজাজ চড়ে গেছে। শাকু মেয়ের মা। মেয়ের মাকে অনেক কথা চেপে রাখতে হয়।

গেলো রোববার থেকে বুলিকা তাকে দরদ দেখাতে শুরু করেছে। পেন্সিল কেটে দিয়েছে। লেবেনচুষ খেতে দিয়েছে। শাকু নিতে চায়নি। হাত মুঠি করে রেখেছে। মেয়ের মা কি-না। কারো কাছ থেকে কিচ্ছু নিতে নেই, তবু বুলিকা সেধে মুঠির ভেতর গুজে দিয়ে বলেছে নে শাকু, লেবেনচুষ খা। শাকু ভাবলো বুলিকা খুব ভালো মেয়ে। অন্য মেয়ের মতো তার মনে কোনো মতলব নেই। এমনিতে ছোটো বলে তাকে আদর করে। একদিন শাকু বুলিকাকেও চিনে নিলো। খানিকক্ষণ সোনাপুতুলের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে শাকুকে বললো, শাকু, আমার পুতুল ছেলের সঙ্গে তোর সোনাপুতুলের বিয়ে হলে খুবই মানাবে। নারে শাকু! বুলিকা তারপর কি বলবে টের পেয়ে গেলো শাকু। মেয়েরা মায়েরা এমনি করে টের পেয়ে যায়। মুখের দিকে না তাকিয়েই পট পট করে বলে দিলো, না আমার সোনাপুতুল এখনো খুবই ছোটো। পরের ঘরে পাঠাবার সময় হয়নি।

সেদিন বিকেল বেলা। হাসিনা তার আম্মার বয়েম থেকে আচার চুরি করে এনে একেবারে শাকুদের ঘরে এসে হাজির। খুব মিস্টি করে শাকুকে ডেকে ঘরের পেছনের আমগাছ তলায় নিয়ে গিয়ে বললো, দেখি শাকু, তোর হাতখানা বাড়া তো।

তারপর একদলা আমড়ার আচার হাতের তালুতে রেখে বললো, নে শাকু খা.. আমড়ার আচার। আম্মার বয়েম থেকে চুরি করে এনেছি। টকটক গন্ধে তার জিভ বেয়ে টসটসিয়ে লালা ঝরছিলো। অল্প একটু মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসিনা বললো, তোমার সোনাপুতুলের সঙ্গে আমার পুতুল ছেলের বিয়ে দিতে হবে কিন্তু, আগে থেকে বলে রাখলাম। ভুলে যেয়োনা যেনো।

একরত্তি মেয়ে হাসিনা। ও-মা, তার পেটে পেটে এতো কুটবুদ্ধি! আচারের দলাটা পাচিলের ওধারে ছুঁড়ে দিয়ে এক ছুটে চলে এলো। হাসিনা ডাকলো পেছনে, এই শাকু শোন্, শোন্। শোনার কথা দূরে থাকুক-একবার পেছন ফিরে তাকায়নিও।

পাড়ার সব পুতুল মেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেলো। কেবল বিয়ে হলোনা

সোনাপুতুলের। পুতুল মেয়ের বিয়েতে ঝর্ণাকে কাঁদতে দেখে তারও অমন করে চোখ ঘষে ঘষে কাঁদতে ইচ্ছে হলো। পাড়ার মেয়েরা শাকুকে দেখলে ভেংচি কাটে। টিটকিরি দেয়। বলে কি-না শাকু আইবুড়ো পুতুল-মেয়ের মা। বিয়ে হলো না সোনাপুতুলের। ভারী লজ্জার কথা।

শাকুর একটু কষ্ট লাগে। ছোটো ছোটো হাত, ছোটো ছোট পা, পিটপিটে একজোড়া মার্বেল পাথরের চোখ, তাতে তারার আলোর মতো কাঁপা কাঁপা আলো, পাতলা দু'খানি ঠোঁট। সোনার অঙ্গ সোনাপুতুলের। এঁটেল মাটি দিয়ে গড়েছে কাঞ্চনপুরের কুমোর। দেখলে মায়া হয়। বুকের তলাটা কেঁপে ওঠে। এমন পুতুল মেয়েকে কি শাকু মা হয়ে যেমন তেমন ঘরে, যেমন-তেমন বরে বিয়ে দিতে পারে? মুখপুড়ীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরুক। কিচ্ছু যায় আসে না শাকুর। মনের মতোন পুতুল ছেলে না পেলে সে দেবেই না সোনাপুতুলের বিয়ে। ডলি, বুলিকা, হাসিনার প্লাস্টিক, নাইলনের পুতুলগুলো নখের যুগ্যিও নয় সোনাপুতুলের।

রাতের বেলা বালিশে শিথান দিয়ে ঘুমোতে যায় শাকু। ঘুম আসে না চোখে। সোনাপুতুলের বরের কথা ভাবে। ছোট্ট ভাই রুশোর যেমন আছে তেমনি একজোড়া টানা টানা চোখ থাকবে সোনাপুতুলের বরের। মোমের শিখার মতো কাঁপা কাঁপা দু'টো চোখের মনি থাকবে। বরের শরীরে থাকবে বাংলা দেশের মাটি। তা নইলে শ্যামলা হবে কেমন করে। লাজুক লাজুক মিষ্টি চেহারার একটি ছেলের কাছেই দেবে সোনাপুতুলের বিয়ে।

বিয়েতে শাকু একটু সাধ-আহলাদ করবে। পাড়ার সব মেয়েদের দাওয়াত করে ধূলো-বালির বিরিয়ানি আর ইটের গুঁড়োর কোর্মা খাওয়াবে। বেশ ধুমধাম হবে। বাড়ীর মোমবাতির বাণ্ডিলটা থেকে দু'য়েকটা করে মোমবাতি সরাতে আরম্ভ করেছে। বিয়ের দিন জোড়ে জোড়ে মোমের বাতি জ্বালিয়ে আর-আর মেয়েদের অবাক করে দেবে। খাটের তলায় একটা আধুলি পেয়েছে। সেটা দিয়ে পট্‌কা কিনবে। একটা তিন পয়সা করে-অনেকগুলো পট্‌কা কিনবে। টুস-টাস করে পটকা ফুটবে। আর সকলে বলবে আজ শাকুর সোনাপুতুলের বিয়ে হচ্ছে। আম্মার ছেঁড়া বেনারসী খানা ছিঁড়ে একখানা ছোট্ট শাড়ী বনিয়েছে সোনাপুতুলের জন্যে। সেটা পরিয়ে বিয়ের সাজন সাজাবে। শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবার সময় চোখ ঘষে ঘষে একটু একটু করে কাঁদবে। কান্না জিনিষটা ভালো নয়। তবে মেয়েদের বিয়ের সময় মা-দের কাঁদতে হয়। বড় ফুফুর বিয়ের সময় দাদি কেঁদেছিলো কিনা। সেদিন বিকেল বেলা। শাকুর বয়েসী একটি মেয়ের হাত ধরে বেবী-ট্যাক্সী থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। মাথায় চকচকে টাক। চোখে চশমা। পেছনে আরেকটা ট্যাক্সী থেকে নামলেন একজন মহিলা। কপালে দগদগে সিঁদুরের একটা ফোটা সন্ধ্যাতারার মতো জ্বল জ্বল করছে।

শাকু গুটি-গুটি পায়ে মাল-পত্তর বোঝাই ট্রাকের দিকে এগিয়ে যায়। পাড়ার ছেলেরা চীৎকার করে বললো, পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এসেছে! শাকুর খেয়াল হলো রিনিদের চলে যাওয়ার পর থেকে ও ধারের একতলাটা খালি ছিলো। এঁরা সে বাসাতেই উঠবেন।

দু'চার দিন আগেপাড়ায় যে ভদ্রলোক এসেছেন তাঁর মেয়েটিকে শাকুর খুব ভালো লেগেগেলো। একদিন রাস্তার ধারে কুটুস-কাটুস করতে করতে মেয়েটার সঙ্গে পরিচয় করে ফেললো। ও খুবই ভালো মেয়ে। একটুও দুষ্টু নয়। নামটাও ভালো, বকুল। শাকু আবার বকুল ফুল ভালোবাসে কিনা।

বকুল শাকুকে তাদের নতুন বাসায় ডেকে নিয়ে গেলো। বকুলের মা একগাল পান চিবাতে চিবাতে জিগ্‌গেস করলেন, ও কে-রে বকুল। তারপর শাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, মা তোমাদের কোন্ বাসা? বকুলের মা-কে শাকুর খুব ভালো লাগলো। বেশ নরোম নরোম কথাগুলো। পিঠে এক বোঝা কালো চুল। বকুলের মা তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন।

তারপর শাকু বকুলের খেলনাগুলো দেখতে লাগলো। বকুলের একটা টিনের হরিনের বাচ্চা, টিনের খেলনা একখানা, প্লাস্টিকের একজোড়া বানর আর মাটির একটা ডানা ভাঙ্গা টিয়ে পাখি আছে। টিয়েটার জন্য শাকুর খুব কষ্ট লাগলো। বেচারি ডানা ভেঙ্গে ফেলে ভারী কষ্ট পেয়েছে। তারপর বকুলকে জিগগেস করলো বকুল তুমি টিনের দোলনায় কাকে দোল দোও।

শাকু, আমার রাখী পুতুলকে টিনের দোলনায় দোল দিয়ে ঘুম পাড়াই।

শাকু আলমারীর কোণার দিকে তাকিয়ে সত্যি অবাক হয়ে গেলো! ও-মা, একটা পুতুল ছেলে। রাতের বেলা ঘুমোবার সময়, জানালার ফাঁক দিয়ে তারার আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে সোনাপুতুলের জন্য যে রকম বর কল্পনা করেছিলো অবিকল তেমনি। টানা টানা ভুরু-টল-টলে চোখ। খুশীতে শাকুর মন গান গেয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো কিন্তু জিভটা চেপে ধরলো। বকুল আবার ভাবতে পারে সেধে সেধে সোনাপুতুলকে গছাতে চাচ্ছে। পুতুলটার সারা শরীরে আরেকবার চোখ বুলিয়ে সেদিনকার মতোন ঘরে চলে এলো শাকু। রাতের বেলা খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে গেলো। আম্মা বাতি নিভিয়ে দিলে সে অন্ধকারে ছোট্ট মাথাটা খেলিয়ে খেলিয়ে একখানা বুদ্ধি বার করলো। পরের দিনে বকুলকে তাদের বাসায় ডেকে আনলো। খেলনার বাক্সটা খুলে তার হাতে একটা শঙ্খ তুলে দিলো। বকুল হাতে নিয়ে বললো, ওতো শঙ্খ, আমাদের বাড়ীতে তিনটি আছে। পুরুত ঠাকুর পূজো করে বাজায়।

শাকু বললো, এ সে শঙ্খ নয়। এ হলো গিয়ে তোমার সাগর-শঙ্খ। কানে লাগিয়ে দিলে সমুদ্দূরের শোঁ শোঁ গর্জন ভেসে আসে। সে কথা বকুল জানতো না। শঙ্খটা কানে লাগিয়ে চেপে রইলো। অনেকক্ষণ পরে রেখে দিয়ে বললো, বেশ মজার তো। কেমন শোঁ শোঁ আওয়াজ আসে।

শাকুর বাক্সে দু'টো রাঙ্গা পেন্সিল আছে। একটা ফুটফুটে বাচ্চার ছবি আছে। চিকন শাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে হাসছে বাচ্চাটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছবিটা দেখার পর বকুল বললো, মা বকবে তা'হলে এখন যাই।

-ওমা এরি মধ্যে চলে যাবে? আমার সোনাপুতুলকেও তো দেখোনি।

শাকু বেজার হয়েছে দেখে বকুলের মনে দুঃখ হলো। বললো, না রে শাকু আমি যাচ্ছিলাম না। এমনি বলেছি। কই, দেখি তোমার সোনাপুতুলল।

একটা ছোট্টো পুতুলের গা থেকে ছিট কাপড়ের বোরকা খুলে নিলো শাকু।

–বাবা, শাকু, তুমি পুতুলকেও বোরকা পরাও!

– বোরকা নয় বকুল, দুষ্টু লোকের নজর লাগতে পারে কিনা, তাই ঢেকে রাখি।

–হ্যাঁ তা ভালো।

বকুল সোনাপুতুলের দিকে চেয়ে থাকে। এমন টুকটুকে সুন্দর পুতুল মেয়ে জীবনে আর কোনোদিন দেখেনি সে। হাতে নিলো। গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলো গাখানি একেবারে পিছল। ছোট্টো সুন্দর পুতুল, ছোট্টো হাত, ছোট্টে পা, টানা চোখ। কেমন নিথর হয়ে চেয়ে আছে। ঢেকে রাখার মতোন মেয়ে বটে শাকুর। অমন সুন্দর পুতুলের গায়ে দুষ্টু লোকের নজর না লেগে যায় না।

মনে মনে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে জিগগেস করলো বকুল, তোমার সোনাপুতুলের বিয়ে হয়েছে শাকু?

–নারে বকুল আমার সোনাপুতুলটির এখনো বিয়ে হয়নি।

–বিয়ে দেবে?

–হ্যাঁরে বকুল, মনের মতোন পুতুল ছেলে পেলে তবেই দেবো আমার সোনাপুতুলের বিয়ে।

–কি রকম পুতুল ছেলে হলে তোমার মনের মতোন হয় শাকু?

–বকুল, আমার সোনাপুতুলের বরের থাকবে টানাটানা ভুরু টলোটলো চোখ। বাঙলাদেশের মাটিতে গড়া শ্যামলা লাজুক শরীর। তেমনি মায়া মাখানো চেহারার মিস্টি মিস্টি একটা ছেলের কাছেই আমার সোনাপুতুলের বিয়ে দেবো।

–শাকু, আমার একটা পুতুল ছেলে আছে। ওর টানাটানা ভুরু, টলোটলো চোখ আছে। খাঁটি এঁটেল মাটি দিয়ে গড়েছে রাখীপুরের কুমোর। ভাই আমার পুতুলের নাম রাখীপুতুল। রাখী পুতুলের মিষ্টি মিষ্টি চেহারায় মরম শরম আভা আছে। দেবে রাখী পুতুলের সঙ্গে সোনাপুতুলের বিয়ে?

শাকুর মনে খুশী ফুলে উঠছে। কিন্তু মুখে কিছু বললো না। তা'হলে বকুল

ভাববে ফেলনা পুতুল মেয়ের মা। তাই সে বললো, তোমার রাখী পুতুলটি ভালো বটে..সুন্দর..বটে..পরশুদিন তোমাকে আসল কথা বলবো।

তারপরের দিন ঝর্ণা এসে বললো, কিরে শাকু আমাদের সঙ্গে খেলতে যাস্‌নে কেনো? শাকু বললো, আজকাল আমি বকুলের সঙ্গে খেলতে যাই। ওর একটা রাখী পুতুল আছে। ওর সঙ্গে আমার সোনাপুতুলের বিয়ে হবে।

হিন্দু পুতুলের সঙ্গে বিয়ে?

ঝর্ণা মুখ ভ্যাংচালো। 'ওমা, বকুলেরা যে হিন্দু...। হিন্দুর পুতুলও তো হিন্দু।

শাকু বললো, দুত্তুরি ঝর্ণা, তোর সব কিছুতে খুঁত ধরার অভ্যেস। পুতুলতো পুতুল। ওদের আবার হিন্দু মুসলমান কি? রাখী পুতুলের সঙ্গে আমার সোনাপুতুলের বিয়ে দেবোই দেবো।

–ঠিক আছে দাওগে, তোমার সঙ্গে আমরা আর মিশবোনা। একঘরে করলাম তোমাকে।

সেদিন বিকেল বেলা বুলিকা, ডলি, হাসিনা, ঝর্না সকলে মিলে খুব ছি-ছি করলো। শাকুর খারাপ লাগলো। শাকু একটু ভাবনায় পড়লো।

পাড়ার মেয়েরা তাকে এখন থেকে টিটকিরি দেবে, ভ্যাংচাবে, ওরা বলেছে বাস্ হয়ে গেলো। তাই বলে সে কি রাখী পুতুলের সঙ্গে সোনাপুতুলের বিয়ে দেবে না? রাখীপুতুলের কথা মনে হওয়ায় তার বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মুখপুড়ীরা হিংসেয় জ্বলে মরুক। রাখী পুতুলের সঙ্গে সোনাপুতুলের বিয়ে দেবেই দেবে।

পরের দিন বিয়ে। পাড়ার মেয়েরা শাকুর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে। বিয়েতে কেউ আসবে না। বিরিয়ানি আর কোর্মা খাওয়াতে পারবে না। পটকা ফাটাতে পারবে না। এতো কষ্ট করে যোগাড় করা মোমের বাতি জ্বালাতে পারবেনা। শাকুর সব শখ সব আশা চুরমার হয়ে গেলো। শাকুর বুক ফেটে-চোখ ফেটে কান্না আসছিলো।

ঠিক দুপুর বেলা সূর্যি যখন আসমানের ঠিক মাঝামাঝি থির হয়েছে, তখনই বকুলের রাখী পুতুলের সঙ্গে শাকুর সোনাপুতুলের বিয়ে হয়ে গেলো।

বুকটা ভেঙ্গে গেলো শাকুর। তার এতো স্নেহের সোনাপুতুল এখন বরের কাছে চলে যাবে। ঘুম থেকে উঠে সোনাপুতুলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারবে না। শীতের রাতে লেপের তলায় বুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতে পারবে না। তবু শ্বশুর বাড়ীতে সোনাপুতুল যেনো সুখে থাকে। মিনতি করে বকুলকে বললো বকুল, সোনাপুতুল বড়ো আদরের পুতুল-তাকে দুঃখ দিয়োনা তুমি। বকুল, সোনাপুতুলের সোনার শরীরে হঠাৎ করে কিল চড় যেনো মেরে

বসো না। বকুল সোনাপুতুল বড়ো ছোট্ট আর কোমল, তাকে যেনো তুমি মাঝে মাঝে মার কাছে নিয়ে এসো।

একটা কান্না শাকুর সারা শরীরে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো। সে তাদের ঘরে চলে এলো। আম্মা টেপ রেকর্ডার কি একটা ইংরেজী গান চড়িয়েছেন। মেঝ ফুফু হারমোনিয়ামে একটা গান গাইতে চেষ্টা করছেন প্যাঁ প্যাঁ করে। ও ঘরে দাদী জায়নামাজে বসে তসবীহ্ দানা টিপছেন। শাকুর মনে খুব দুঃখ। শোকে শাকুর ছোট্ট বুকখানিতে শোক উথলে উঠছে। কেউ জানলো না শাকু কাঁদছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঐ দূর পশ্চিম দিক থেকে একটা চিকন সুরের রেশ ভেসে ভেসে শাকুর কানে এসে বাজলো। সুরের ফুলকি দমকা বাতাসের পাখায় আগুনের মতোন জ্বলে জ্বলে ওঠেছে। পয়লা শুনেছিলো একটু একটু, এখন পষ্ট শুনতে পাচ্ছে-এ সুরের সঙ্গে তার বুকের দুঃখের কোথায় যেনো মিল আছে।

হঠাৎ দাদী তসবীহ্ বন্ধ করে বললেন, বহুদিন পর আমার বাপের দেশের শব্দ যেনো শুনি! ও বৌমা, আমার বাপের দেশের শব্দ! সুরটা কেঁদে কেঁদে তাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। দাদী ঘোলা ঘোলা চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। আম্মা রেকর্ডার বাজনা বন্ধ করলেন। এখখুনি বুঝি কাঁদবেন আম্মা। প্রতিরাতে কাঁদেন আম্মা। একা একা। চুপি চুপি। কেউ শুনতে পায় না যেনো। মেজ ফুফু কপাল কুঁচকে বললেন,–রাবিশ! একটা একতারাঅলা কোত্থেকে এসে সব বানচাল করে দিলো। শাকু নীচে নেমে এলো। একটা লোক বাঁশের একতারাতে ছড় টানছে। টানে টানে কেঁদে উঠছে সুর। খুব বুঝি কষ্ট একারতাঅলার মনে। সোনাপুতুলকে বিয়ে দিয়ে যে-রকম লাগছে, তেমনি দুঃখ বাতাসে একাতারাঅলার তারে ঝরে পড়ছে। একতারাঅলাটি বুঝি দাদীর বাপের বাড়ীর মানুষ।

মুখে একমুখ কালো মেঘেরবরণ দাড়ি, জামাটা ময়লা। বড়ো বড়ো ভাসা ভাসা দু'টো চোখও দুটো চোখ দিয়ে বুঝি দাদির বাপের দেশের পাহাড় দেখেছে, সবুজ মাঠ দেখেছে। অমন গভীর গভীর চোখের কোনো মানুষ শাকু জীবনে কোনোদিন দেখেনি। মাথার রুখুসুখো চুলগুলোতে একরাশ ধুলো জমেছে। লোকটি একমনে একতারা বাজিয়ে চলেছে। শাকু ডাক দিলো,––

-এ্যই একতারাঅলা।

ছড়িটানা বন্ধ করে পাহাড়-দেখা, নদী-দেখা, গভীর দুচোখ মেলে সে বললো, কি খুকি, ডাকলে কি আমাকে?

–বলছি তোমার একতারাটি কি ভালো। আর বাজাতেও জানো সুন্দর করে। আজকে আমার সোনাপুতুলের বিয়ে দিয়েছি। মনের ভেতর অনেক দুঃখ ফুলে ফুলে উঠছে। মনটা আমার ভালো নয়। এই আমগাছের ছায়ায় এসে আমাকে একটু বাজনা শোনাবে?

একতারাঅলা জবাব দিলো,–খুকী লোকে শুনবে, শুনে দুঃখ দূর করবে বলেই তো আমি একতারা বাজাই। ছোট্ট খুকী, সোনাপুতুলকে বিয়ে দিয়ে তোমার বুকখানা দুঃখে ছেয়ে গেছে। তোমারে একতারা বাজিয়ে শোনাবো বৈকি।

একতারাঅলা রাস্তা থেকে আমগাছের ছায়ায় সরে এলো। লম্বা লম্বা টান দিতে লাগলো ছড় দিয়ে। চোখ বন্ধ করে ছড় টানছে। দুপুরের পৃথিবীটা কেমোন কোমল মনে হয়। পুতুলের মতোন দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে শাকু শোনে।

হঠাৎ একতারাঅলা ছড়টানা বন্ধ করে শাকুর দিকে গভীর গভীর দুটো চোখে তাকালো। জানতে চাইলো শাকু,-

-আচ্ছা একতারাঅলা তোমার একতারা এতো কাঁদে কেন?

-হ্যাঁ খুকী, আমার একতারা কাঁদে।

-সবসময়?

-হ্যাঁ। সব সময় নদী কাঁদে, পাহাড় কাঁদে-আমার একতারাও কাঁদে?

-পাহাড় তো পাথর দিয়ে গড়া। পাথরের আবার দুঃখ কিসের, পাহাড় কেমন করে কাঁদে?

-খুকী, ছোট্ট খুকী, পাথর দিয়ে গড়া পাহাড় কঠিন পাহাড়, সে পাহাড়েরও দুঃখ আছে-সারাদিন, সারারাত কাঁদে সে পাহাড়।

-একতারাঅলা, পাহাড়ও কি ব্যথা পায়?

-ঠিক ধরেছো খুকী। সোনাপুতুলকে বিয়ে দিয়ে তোমার বুকে যেমন ব্যথা নেমেছে, তেমনি ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এমন ব্যথা কঠিন পাথুরে পাহাড়ের বুকেও।

-আচ্ছা একতারাঅলা, তোমার মনেও বুঝি ব্যথা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো একতারাঅলা। ভাসা ভাসা দুচোখ বুজে কি যেন ভাবলো। তারপর রুখুসুখু ধূলোমাখা চুলে একটা নাড়া দিয়ে বললো,-পাহাড়ের কঠিন পাথরে ব্যথা, নদীর জলে ব্যথা, ফুলের মতোন সুন্দর নিষ্পাপ খুকী তোমার মনে ব্যথা; তাই আমারও ব্যথা আছে। একতারার ঝংকারের মতোন ব্যথা।

একমনে একতারা বাজাতে থাকে সে। ছড়ির টানে টানে পাথরগলা সুর ধীরে ধীরে বইতে থাকে। শাকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,-আচ্ছা একতারাঅলা তোমার বৌ আছে?

পাহাড়-নদী সবুজ মাঠ দেখা চোখ দু'টো মেলে সে বলে-খুকী বাজনা শোনো।

তারপর ছড় টেনে যেতে থাকে।

-আচ্ছা একতারাঅলা, তোমার ছেলে আছে? আবার জিগগেস করে শাকু। খুকী এবার মন দিয়ে শোনো। এটা নতুন সুর। তুমি ছাড়া কাউকে শোনাইনি। চোখ না খুলেই বললো একতারাঅলা। অবিরাম কেঁদে চলেছে একতারার তার। শাকু ছোট্ট হাতে একতারাঅলার হাতখানা ধরে বললো-কথা কওনা কেনো একতারাঅলা? তোমার বউ কোথায়? ছেলে কোথায়? দেশ কোথায়?

কাঁদো কাঁদো সুরে একতারাঅলা বললো, কি কথা কইবো খুকী, আমার বউ নেই, ছেলে নেই, দেশ নেই।

-তা'হলে তোমার কি আছে একতারাঅলা?

কেনো খুকী, আমার একতারা আছে। একতারার তারে পাহাড়ের বুকের কান্না, নদীর কুলু কুলু দুঃখ, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, ফুলের মতোন সুন্দর খুকী, তোমার ছোট্ট মনের দুঃখও বাজে আমার একতারার তারে। আর আমার কি চাই!

শাকু আবার কি বললো। একতারাঅলা শুনতে পেলোনা। একমনে বাজিয়ে যেতে লাগলো। আবার ছোট্ট হাতে ছড়িখানা ধরে শাকু জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা একতারাঅলা, তুমি এতো কালো কেনো?

-তাহলে খুকী শোনো। আগে আমি এতো কালো ছিলাম না। ঐযে দেখছো আসমানের পশ্চিমে মেঘে লাল লাল আগুন ধরেছে–সে আগুন বুকে নিয়েছি। বুকের কথাকে সে আগুনে পুড়ে সুর করেছি, তারপর একতারার তারে চড়িয়েছি। সেই সুরের লাল আগুনে আমি জ্বলে গেছি, পুড়ে গেছি। ফুলের মতো খুকী.. আমি কোকিলের মতোন কালো হয়ে গেছি।

-আচ্ছা একতরাঅলা, তোমার বুক জ্বলে না।

-হ্যাঁ খুকী আমার বুক জ্বলে। তাইতো আমি সিঁদুর মেঘের সিঁদুরিয়া সুর বাজাই।

-আচ্ছা একতারাঅলা মানুষ তোমার বাজনা শোনে?

-খুকী যাদের মনে ব্যথা আছে তারা আমার বাজনা শোনে।

-চেনো তুমি তাদের?

-আমার চেনায় কাজ কি? একতারা যে তাদের চেনে! সকল দুঃখী মানুষদের অন্তর একরকম-আমার একতারার সুরেরমতোন।

-বড়ো মজার কথা বললে একতারাঅলা।

-মজার কথা, কিন্তু সত্যি কথা।

-একতারাঅলা, তোমার বাজনা যারা শোনে তাদের সকলের কি সোনাপুতুল আছে?

-খুকী, সব মানুষের একটা করে সোনা পুতুল থাকে। হারিয়ে ফেললে কিংবা বিয়ে দিলে সকলেই কাঁদে।

-আম্মার আর দাদীর তো কোন সোনাপুতুল নেই, তাঁরা কেনো কাঁদেন?

-ছোট্ট খুকী, তোমার ছোট্টো চোখে দেখতে পাওনা, সব মানুষের একটা করে সোনাপুতুল থাকে।

-কিন্তু মেজফুফু তো কোনোদিন কাঁদেনা

-তোমার মেঝফুফু সোনাপুতুলকে চিনতে পায়নি, আদর করেনি, তাই কাঁদেনা।

-তাই বুঝি মেজফুফুর গান ভালো হয়না। পাড়ার লোকে হাততালি দেয়, মুখ টিপে হাসে।

খুকী, অবিরাম কেঁদে যাওয়া নদী আমার কানে কানে একটা কথা

বলেছে, তোমার কাছে তা বলি, সব মানুষ আজ হোক কাল হোক সোনাপুতুলকে চিনতে পারবে। আদর করতে শিখবে। তোমার মেজফুফু ও সোনাপুতুলকে চিনে। নিয়ে আদর করলে মনে ব্যাথা আসবে, ব্যাথার ঢেউ লেগে গান মধুর হবে। কেউ হাততালি দেবেনা। অবাক হয়ে শুনবে।

তাই যেনো হয় একতারাঅলা।

-হ্যাঁ খুকী হবে। শাকু মনের কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা একতারাঅলা, তোমার একতারার সুর শুনলে দাদীর বাপের বাড়ীর দেশের কথা মনে হয়। কখনো সে দেশ আমি দেখিনি। সে দেশে কালো পাহাড় মেঘের দেশে নীল শিং তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়-গলা পানির নদী চুল বাঁধার ফিতের মতোন মাঠের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে বয়ে গেছে। দুই তীরে মাঠ। মাঠে ধান কন্যারা বাতাসের তালে নেচে ওঠে। রাখাল বাঁশী বাজায়। পাখী গান গায়। রাতের বেলা থালার মতোন একখানা বড়ো চাঁদ উঠে পাহাড়ের ওপর জেগে থাকে। নিবিড় ঘন গাছপালা থেকে ঝরে পড়ে কালো কালো অন্ধকার। অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে জোনাক-পোকা পিদিম জ্বালায়। কোনোদিন সে দেশ আমি দেখিনি। আচ্ছা একতারাঅলা, তুমি কি সে দেশের মানুষ?

-ফুলের মতোন সুন্দর খুকী, ছোট্ট খুকী, তোমার বুদ্ধিখানি পরিস্কার। নদী, পাহাড় আর সবুজ মাঠের দেশের মানুষ আমি! পাহাড়-ছোয়া কান্না আমার একতারার তারে, কেঁদে-যাওয়া নদীর দুঃখ আমার মনে, সবুজ ধানের দুলুনি আমার তারে। জোনাক পোকার আগুন আমার মনে।

-একতারাঅলা ও একতারাঅলা, আমাদের ড্রয়িংরুমে একবার এসে বসবে তুমি ফ্যানের নীচে?

-খুকী আমি ড্রয়িংরুমে বসিনা, ফ্যানের হাওয়া খাইনা।

-কি করো তুমি?

-সোনাপুতুলের শোকে ঘুরে বেড়াই।

তারপর একতারাঅলা পশ্চিম দিকে চেয়ে বললো, খুকী সন্ধ্যে হয়ে এলো এখন আমি যাই।

-তুমি মাঝে মাঝে এসে একতারা শুনিয়ে যেয়ো আমাকে। নইলে সোনাপুতুলের ব্যাথাটা বেশী লাগবে বুকে।

-খুকী, তোমাকে বাজনা না শোনাতে পারলে আমি যে বাঁচবো না।

একটা করুণ সুর তুলে যে দিকে সূর্য ডুবছে, সিঁদুরে মেঘ উঠছে, সে দিকে চলে গেল একতারাঅলা।

আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে শাকু মনে মনে বললো, হেই আল্লাহ, আমার মেজ ফুফুর যেনো একটা সোনাপুতুল হয়।

ঘোড়া চুরির সাক্ষী

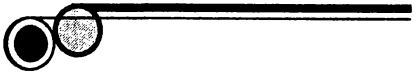

এক ছিলো ঘোড়া ব্যবসায়ী। সে হাটে হাটে ঘোড়ার ব্যবসা করতো। একদিন হাটে গিয়ে সবগুলো ঘোড়া বিক্রি করে ফেললো। রইলো শুধু একটা ঘোড়া। খদ্দেররা কেউ কিনলো না। বাতাসের মতো চলে বেগে যে ঘোড়া, সুন্দর চিকন কেশরগুলো ওঠে দুলে, সে ঘোড়াকে কেনার টাকা হাঁটুরে লোকের কই। এমন মেঘ ডম্বুর শাড়ীর মতো গায়ের রঙ যে ঘোড়ার, তাকে কিনতে পারে দুঃসাহসী রাজার কুমার। তীরের মতো ছুটবে। ছয়দিনে যাবে ছ'মাসের পথ। সবকিছু ভাবাগুনা করে কিস্কিন্ধ্যার রাজধানীতে যাবার কথা ঠিক করলো। রাজকুমারকে দেখাবে ঘোড়াটা। চলতে গেলে চিকন কেশর রেশমের মতো দোলে, তীরের আগে চলে। রাজকুমারকে গিয়ে বলবে, কুমার আপনি এ ঘোড়া কিনুন, এ আপনার যুগ্যি ঘোড়া। মনের মতো খদ্দের পাইনে বলে বিক্রি করিনি। যেমন তেমন খদ্দেরের কাছে ময়ূরের মতোন ঘাড় বাঁকিয়ে চলে, এমন ভালো জাতের ঘোড়া বিক্রী করতে কি মন যায়? হাঁট থেকে সে ঘরে গেলোনা। বউকে খবর পাঠালো। তোমার চিন্তার কারণ নেই। দেওরাজ ঘোড়া নিয়ে কিস্কিন্ধ্যা রাজ্যে যাচ্ছি। দেখবে পনেরো দিন পর আমি এক বস্তা টাকা নিয়ে ফিরবো। ঘোড়া ব্যবসায়ী পথ নিলো।

পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। বিরাট মাঠ। পশ্চিমের উঁচু-তালগাছ গুলোর মাথায় সূর্যের আলো চিক্‌চিক্ করে ডুবে গেলো। তারপরে নামলো আঁধার। থইথই কালো আঁধার। কালো আঁধারে মাঠের শূন্য বুক ভরে গেলো। ঘোড়া ব্যবসায়ীর গা ভয়ে ছম্ ছম্ করতে লাগলো। বিরান মাঠ। বিজন পথ। লোকজন নেই। ঘর বাড়ি দেখা যায় না। কোথায় যাবে ভিন দেশের ঘোড়া ব্যবসায়ী? এই আঁধারে আর কি করে। আস্তে আস্তে ঘোড়াসহ হাঁটতে থাকে। বোশেখের আকাশে কাট্ কাট্ মার মার শব্দে ক্ষেপা হাওয়া বয়ে গেলো। মড়মড় করে গাছ গুলোর মাথা ভাঙতে লাগলো। বিজন মাঠে তুফান উঠছে, দেও নাচছে, দানো নাচছে, রশি বাঁধা দেওরাজ ঘোড়াও নেচে উঠতে চাইছে। তারপরে নামলো বড়ো বড়ো ফোটায় বিস্টি। ভিজে ভিজে ঘোড়ার ব্যবসায়ী

বেশ কদ্দুর গেলো। সামনে পেলো একটা তেতুল গাছ। ভারী হয়রান হয়ে পড়েছে। আর চলবার সাধ্যি নেই। তেতুল গাছের শেকড়ের সঙ্গে রশি লাগিয়ে দেওরাজ ঘোড়াটিকে আচ্ছা করে বাঁধলো। তারপরে নিজে তেতুল গাছটার ওপরে চড়ে বসলো। এক ডালে পা রেখে আরেক ডালে মাথা দিয়ে চোখ বুজেছিলো। চোখে আবছা ঘুমের মতো আবেশ লেগেছিলো। হঠাৎ কেনো জানি চোখ মেলে চাইলো। কালো কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে গোল মতো একখানা চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো সারা মাঠে থই থই করছে। নীচের দিকে চেয়ে দেখে কে একজন রশি খুলে ঘোড়াটা নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে এসে জিগগেস করলো?

– কে তুমি আমার দেওরাজ ঘোড়া নিয়ে যাও চুরি করে? চোর বললো,– এ্যাই মুখ সামলে কথা বলবি। এ হলো আমার ঘোড়া। এর নাম তেতুলে ঘোড়া। তেতুল গাছ বিইয়েছে কিনা। ঘোড়া চোরের কথা শুনে ঘোড়া ব্যবসায়ীর মুখ দিয়ে কথা সরেনা। দু'দিনের পথ হেঁটে ঘোড়া নিয়ে সে মাঠে এলো। কাল বোশেখীর ঝড় পেরিয়ে বিষ্টিতে ভিজে আধারাতে তেতুল গাছের শেকড়ের সঙ্গে ঘোড়া বাঁধলো। চোর এসে ঘোড়াটা নিয়ে যাচ্ছে। জিগগেস করাতে সে কিনা বলে তার ঘোড়া তেতুল গাছ বিইয়েছে। মালিক চোরকে অনেক অনুনয় বিনয় করলো। কাকুতি মিনতি করলো, বললোঃ

–ভাইজান ঘোড়াটি আমাকে ফেরৎ দাও। এ হ'লো রাজকুমারের যুগ্যি ঘোড়া দেখোনা কেমন ছিরিছাঁদ। তুমি চোর মানুষ, এ ঘোড়া তোমার কোনো কাজেই আসবেনা। চোর চোখ লাল করে বললো,–

– ফের যদি চোর চোর করিস মার খাবি। তুই একটা ঠকবাজ।

এমনি ভাবে তক্ক করতে করতে দু'জন এলো এক গাঁয়ে। তখন সক্কাল বেলা। সূয্যিটা আকাশে মিষ্টি মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। গাঁয়ের মোড়ল যাচ্ছিলেন পথ দিয়ে। দু'জনের ঝগড়া শুনে তিনি একটু দাঁড়ালেন। তারপর জানতে চাইলেন।

–বাপু রকম সকম দেখে মনে হয় তোমরা বিদেশী। তা ঝগড়া করছো কেনো? আমার গাঁয়ে কেউ ঝগড়া করতে পারে না। দু'জনের কি বিত্তান্ত খুলে বলো। উচিত বিচার করে দেবো। আমি হলাম গিয়ে গাঁয়ের মোড়ল।

– ব্যবসায়ী কাঁদতে কাঁদতে বললো,

–হুজুর আপনাকেই খুঁজছি। আমি এ ঘোড়াটি নিয়ে কিস্কিন্ধ্যার রাজদরবারে যাচ্ছিলাম। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যে নামলো। রাত হয়ে এলো। কালো আঁধার সমস্ত পথ ঢেকে দিলো। আর কি করি তেতুলের গাছের শেকড়ে ঘোড়াটা বেঁধে ওপরে চড়ে বসি। আধা রাতে চেয়ে দেখি এ লোকটি এসে ঘোড়াটি নিয়ে যাচ্ছে। নেমে এসে ঘোড়া কেনো নিয়ে যাচ্ছে জিগগেস

করতে এ লোকটি আমাকে বলে, 'তোর কি ঘোড়া, ঘোড়া বিইয়েছে আমার তেতুল গাছ।' হুজুর আপনি বুড়ো মানুষ, মোড়ল মানুষ, এর বিচার করুন।

চোরটি বললো,–

–হুজুর, আপনি এ লোকটির কথার বিশ্বাস করবেন না। ব্যাটা এক নম্বরের ঠকবাজ। আমার বাবার দিনের তেতুল গাছ ঘোড়া বিয়ালো। গর্ভবতী তেতুল গাছের গোড়ায় সারা বছর পাহারা দিলাম। গাছের পেট থেকে বাচ্চাটা খালাস পেয়ে যেই মাটিতে নেমে লাফাতে শুরু করলো, অমনি দড়ি বেঁধে বাড়ীতে নিয়ে চলেছি, মাঝ পথে এ ব্যাটা কোত্থেকে এসে বলে আমার ঘোড়া। চেহারা সুরত দেখুননা হুজুর কেমন চোরের মতো দেখায়। তাই বলি হুজুর কলিকাল, ঘোর কলিকাল। নয়তো এমনি কেউ করতে সাহস করে। আমার তেতুলে ঘোড়াকে নিজের বলে দাবী করে? হুজুরের সুবিচারের সুনাম শুনেছি। হুজুর বিচার করুন।

চোরের মিস্টি কথায় মোড়লের মন গলে গেলো। তিনি চিন্তা করলেন হতে পারে তেতুল গাছ ঘোড়াটিকে বিইয়েছে। তিনি বললেন,–

–ঠিক আছে তোমরা ঘোড়াটা আমার দহলিজের কাছে জিউল গাছটায় বেঁধে একটু অপেক্ষা করো। আমি আরো দু-পাঁচ জনকে ডাকি। বিচার আচারের কাজ একা করা ভালো নয়।

ঘোড়াটা বেঁধে দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলো। মোড়লের উঠানেই বসলো বিচার সভা। ঘোড়া ব্যবসায়ী চোখের জলে তার বক্তব্য বললো, চোর গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো, তবে বারবার বললো,–

–আপনারা ঠকবাজ জুচ্চোরের কথায় বিশ্বাস করবেন না। কসম করে বলছি; তেতুল গাছে- ঘোড়া বিইয়েছে। এ আমার ঘোড়া। দানাপানি কিছু খায়নি। হুকুম দিন নিয়ে যাই। তখন বিচারকেরা ব্যবসায়ী আসল মালিককে জিগগেস করলো, এ ঘোড়া যে তোমার কোনো সাক্ষী আছে?

ঘোড়া ব্যবসায়ী কেঁদে কেঁদে বললো,–

–আমি ঘোড়া বেপারী মানুষ। এদেশ ওদেশ ঘোড়ার বেপার করি। কে চেনবে আমাকে? কে সাক্ষ্য দেবে?

বিচারকেরা বললো,–

–তাহলে বাপু আমরা আর কিছু করতে পারলামনা। আমরা বুঝেছি তেতুল গাছে খোড়া বিইয়েছে। সুতরাং ঘোড়া এ লোকের। ঘোড়া ব্যবসায়ী বললো,–আমি আপনাদের বিচার মেনে নিতে পারিনি। আপনারা ভিনদেশী গরীব ব্যবসায়ীর ওপর জুলুম করলেন।

মোড়ল সাদা চুলে হাত দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বললেন–

–তিনকুড়ি দশ বছর বয়েস হলো। আমার বিচারে অসন্তুষ্ট হয়েছে, এমন কোনো লোকের নাম জানিনে। তুমি যদি আবার বিচার করাতে চাও তা'হলে

গিয়ে রাজার কাছে বিচার দাও। কিন্তু বিদেশী মনে রেখো তুমি বুড়ো মানুষকে, এইখানে এই বুকের মাঝেই আঘাত করলে, অবিচারের অপবাদ দিলে।

ঘোড়া ব্যবসায়ী রাজদরবারে এসেই রাজার কাছে চোরের নামে নালিশ করলো। আগের মতো বললে সবকিছু। রাজা চোরকে পেয়াদা দিয়ে ডাকিয়ে আনলেন। চোর এলো। রাজা প্রশ্ন করলেন,–

–কি, তুমি এইলোকের ঘোড়া কেনো ফেরত দিচ্ছোনা

– চোর বললো,–

–মহারাজ, ঘোড়া আমার। এই লোক মিথ্যে কথা বলছে। মোড়ল সাহেবেরা বিচার করে ঘোড়া আমাকে দিয়েছেন। কসম করে বলছি মহারাজ, তেতুল গাছে এ ঘোড়া বিইয়েছে। আমি বছরের পর বছর ধরে তেতুল গাছকে পাহারা দিচ্ছি। মহারাজ বিশ্বাস করুন, যা বললাম এ একবিন্দুও মিথ্যে নয়।

–মহারাজ ঘোড়ার ব্যবসায়ীকে জিগগেস করলেন,

–ওহে তোমার কোনো সাক্ষী আছে?

–না মহারাজ আমার কোনো সাক্ষী নেই।

–সাক্ষী নেই? তা'হলে আমার রাজ্যের আইন মতো এই- লোককে দিয়ে দিচ্ছি। চোর ঘোড়ার রশি ধরে বুক টানটান করে মুচকি হেসে চলে গেলো। ঘোড়া ব্যবসায়ী কেঁদে কেঁদে রাজদরবার হতে ফিরছিলো। পথে দেখা হয়ে গেলো মহামান্য শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে?

মানুষের কান্না শুনে মহামান্য পণ্ডিত সাহেব চোখের পিচুটি মুছে জিগগেস করলো,– এই বুদ্ধিহীন মানুষ অমন ভেউ ভেউ করে ভেড়ার মতো কাঁদো কেনো?

ঘোড়া ব্যবসায়ী সব কথা জানালো। মহামান্য পণ্ডিত সাহেব লেজ ঘুরাতে ঘুরাতে একটা বিকট হাই তুলে বললেন,–

–ওঃ এই ব্যাপার। মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত থাকতে তোমার ভাবনা কিসের? যাও আবার রাজার কাছে। মহারাজকে বলবে, তুমি বলতে ভুলে গিছিলে গতবার। তোমার একজন সাক্ষী আছে, নাম জিগগেস করলে বলবে, মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত সাহেব। মহামান্য পণ্ডিতের কথামতো আবার রাজদরবারে গিয়ে নূতন করে নালিশ করলো। আবার মোকদ্দমার দিন পড়লো। চোর আর ঘোড়া বেপারী দু'জনে হাজির হলো। সাক্ষ্য দিতে মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত সাহেবও গেলেন রাজদরবারে। দরবারে রাজা বিচার করতে বসেছেন। ঘোড়া চোরের মামলাটি ধরেছেন। সাক্ষীর নাম ডাকলেন, 'মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত সাহেব, মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত সাহেব।'

শেয়াল পণ্ডিত দরবারের এক কোণে বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। যেনো রাজার কথা শুনতেই পাননি। রাজা বিরক্ত হয়ে ডাকলেন,

এই ব্যাটা মুরগী চোর ধূর্ত শেয়াল।

পণ্ডিত সাহেব রাঙা দু'চোখ মেলে সাড়া দিলেন

–হুজুর ডাকলেন নাকি আমাকে?

মহারাজ বললেন,–

–মামলাতে সাক্ষী দিতে এসে ঘুমাও কি ব্যাপার।

–হুজুর অপরাধ ক্ষমা করবেন। গতকাল সমুদ্দুরে আগুন লেগেছিলো।

সবমাছ ওপরে উঠে এসেছিলো। তাই মাছ খাওয়ার জন্য ঘুমোতে পারিনি। মহারাজ রেগে গিয়ে বললেন,–

–ওরে কে আছিস এই বেতমিজ শেয়ালকে বন্দী করে রাখ, সমুদ্দুরে কি আগুন লাগে? কেমন মিথ্যে কথা।

মহামান্য শেয়াল পণ্ডিত আরো রেগে গিয়ে বললেন,–

–ওরে কে আছিস এ পাগলা রাজাকে বন্দী কর। গাছ কি ঘোড়া বিয়ায়? কেমন ধারা বিচার?

রাজা মাথা চুলকে বললেন, 'তাইতো, গাছেতো ঘোড়া বিয়ায়না। সভাসদ পাত্র মিত্রেরাও মাথা চুলকে চুলকে বললো, তাতো বটে, তাতো বটে,–গাছে কেমন করে ঘোড়া বিয়াবে?

নতুন হুকুম হলো। আসল মালিককে ঘোড়া দেয়া হোক। আর চোর বেটাকে চাবুক মারা হোক।

দুটি মর্মর মূর্তির কাহিনী

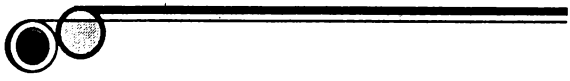

রাহমান সাহেবের মাথায় একখানা চিন্তা জেগেছে। ক'দিন থেকে মগজের সরু আলপথ দিয়ে চিন্তার অশান্ত পিঁপড়েটি হাঁটছে কেবল হাঁটছে। তিনদিন ভালো করে খাওয়া হয়নি রাহমান সাহেবের। তিনদিন তিনি ঘুমোতে পারেননি।

মাঝে মাঝে এমনি অশান্ত চিন্তা রাহমান সাহেবের চকচকে টাকপড়া মাথাটার ভেতর বিজুলির শিখার মতো ঝিকঝিকয়ে ওঠে। তখন তিনি খেতে পারেন না। তখন তিনি ঘুমোতে পারেন না। একেকটি চিন্তা মগজের ভেতর ফুলের মতো ফোটে। কি রং, কি বাহার। তিনি রাতভোর জেগে থাকেন। মনে মনে অসাধ্যি সাধনের মধুর মধুর স্বপ্ন দেখেন।

রাত থাকতে বিছানা ছেড়েছেন। কলের ট্যাপ খুলে হাতমুখ ধুয়েছেন। রাতের আকাশের সোনালী বুদবুদের মতো অগুনতি তারার কাঁপা আলোর দিকে একনজরে তাকিয়েছেন। তারপরে ঢুকেছেন লেবোরেটোরী ঘরে। কালো মলাটের মোটা মোটা বই শেলফ থেকে পেড়ে এনেছেন। পাতার পর পাতা উল্টিয়ে গেছেন। দরকারী জিনিষগুলো কাগজের সাদা প্যাডের বুকে টু-কটুক করে নোট করেছেন। লেখার কাজ শেষ করে বইগুলো আবার আগের জায়গায় সাজিয়ে রেখেছেন। পাশের কক্ষে গিয়ে ঝকঝকে কাঁচের পাত্রের ভেতর থেকে তিনটি বীজের প্যাকেট এনেছেন। বীজ ভান্ডারের দরজাটা আটকে স্থির হয়ে স্টীলের চেয়ারে বসেছেন। আলমারীটা বাঁ-হাতে খুলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা টেনে নিলেন। বীজগুলোর খোসা ছাড়িয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচের নীচে রাখলেন। বাঁ চোখটা ছোটো করে ডান চোখ দিয়ে দেখতে লাগ-লেন একমনে। বীজের কোণায় ঘুমিয়ে আছে প্রাণ। উপযুক্ত জল বাতাস আর তাপ পেলে সে প্রাণ সবুজ কোমল অঙ্কুর হয়ে জাগবে। উদ্ভিদ বিদ্যার কালো মলাটের বইগুলোর পাতা সবুজ প্রাণের বিচিত্র কাহিনী দিয়ে ভরা। আশ্চর্য, অদ্ভুত কতো কাহিনী বীজের ভেতরের ঐ সূঁইয়ের ডগার মতো বিন্দুটিতে শুয়ে

থাকে। যেই একটুকু জলের ছিটে লাগলো, অমনি স্বপ্ন দেখতে থাকলো। তারপরে যখন অল্প অল্প কুসুম সুসুম তাপ লাগলো বীজে, আর দেরী নেই। নীচের দিকে সূতোর মতোন চেকন চেকন শেকড় ছাড়তে থাকলো। ওপরদিকে জাগলো অঙ্কুর। লকলকিয়ে বেড়ে ওঠলো, সূর্যের সামনে মেলে দিলো কচি কচি পাতা। একটি সবুজ পাতার আঁকা বাঁকা শিরার ভেতরে কতো যে আজব কাহিনী।

রাহমান সাহেব বীজের ভেতরে হারিয়ে গেছেন। রাত গভীর হয়েছে। টুপটাপ শিশির পড়ছে। তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। বুকে ধুকধুক শব্দ হচ্ছে তাও শুনতে পাচ্ছেন না। মাথার ভেতরের চিন্তাটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচের ওপর থরথরিয়ে কাঁপছে। চিন্তার আলো দিয়ে বীজের প্রাণ কণাগুলো পরীক্ষা করছেন। তাঁর মনের আনন্দ লতার মতো লতিয়ে উঠছে। কালো মলাটের বইগুলোর নির্দেশমতো মাথা খোঁচানো চিন্তাটি বীজের মধ্যে যদি মুক্তি দিতে পারেন, তা'হলে জন্ম নেবে আরো নূতন, আরো মজার কতো কাহিনী। পরীক্ষা করা বীজগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সবল সতেজ উন্নতজাতের বৃক্ষ শিশু। শুধু প্রয়োজন আরেকটু নিরীক্ষা। তখন আমাদের কৃষি কাজে আসবে একটা বিপ্লব। জমিগুলো বেশী ফসল ফলাবে, ধান গাছে ধরবে বেশী ধান, ফল ফলারের গাছে আরো বেশী ফল ফলবে। দেশে অভাব থাকবেনা। না খেতে পেয়ে মারা যাবেনা কেউ। তেমনি একটা কৃষি বিপ্লবের চিন্তাই উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রাহমান সাহেবের চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে দিয়েছে। ভাবতে কেমন লাগে আমাদের কৃষি কাজে আসবে একটা বিপ্লব কে যেনো কানের কাছে গানের সুরেসুরে সে কথা বলে দিয়ে যায়। তাঁর টলোটলো দু'টি কালো চোখের মণির ভেতর স্বপ্ন ওঠে কেঁপে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটার কালো মসৃণ তেলতেলে শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করেন। সোনালী ধানের মাঠ, স্বাস্থ্যবান মানুষ, প্রাণ চঞ্চল শিশু আর ঢেউ কাঁপা নদীর দৃশ্য ঝলকে ঝলকে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন। আসমানের বাগানের তারার ফুল মরে গেছে। আকাশের পূবে শুকতারাটি একটি তাজা কয়লার মতো দপদপিয়ে জ্বলছে। আকাশ জুড়ে সাদামতো 'ধল পহর' নেমেছে। রাতের কালো আবরণে ঠোকর দিয়ে বনের ভেতর বন মোরগ বাঁক দিলো কোঁকঁরকোঁ। কোঁকঁরকোঁ। পাহাড় গুলো যেনো দৈত্য দানো, হাল্কা কুয়াশার চাদরে শরীর ঢেকে বসে আছে। হিম হিম হাওয়ার তোড়ে কুয়াশার জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। ঐ হোথা বাঁকা রেখা জাগলো। সেটি ফুলে ফুলে ফেটে গেলো। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো সোনালী পদ্মফুলের মতো শিশু সূর্য। এক লাফে পাহাড়ের চূড়োর ওপর চড়ে বসলো। সোনালী হাসির ছোঁয়ায় পাহাড়গুলো রঙীন হয়ে উঠলো।

রাতের কালো শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো দিন। উজ্বল সুন্দর। রাঙ্গা আলোকে ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দুগুলো উঠলো ঝলমলিয়ে। পাখপাখালি ডাকছে। সূর্য তাতছে আস্তে আস্তে। পাহাড়িরা বাঁকা উঁচু নীচু পথে গরু বাছুর তাড়িয়ে 'জুম' চাষ করতে ছুটছে। চারদিকে ক্ষেত খামার। মাঝখানে সাদা বাড়ীটা। সদ্য চূণকাম করা। সূর্যের রাঙ্গা আলোকে ঝক ঝক করছে।

ওপাশ থেকে ভেসে আসছে কচি গলার মধুর গান। হিমেল বাতাসে ঢেউ দিচ্ছে কোমল কোমল সুর। অনেকগুলো কচি বাঁশের মুরলী বাঁশী যেনো একসঙ্গে বেজে যাচ্ছে। রাহমান সাহেবের খামারে ছেলেরা গান গাইছে একসুরে।

আমরা ফুল ফুটাইরে-
আগুন বরণ স্বপন ছোঁয়া
ঘুমের ভেতর কথা কওয়া
গোপন গানের চেকন সুরে।
ওগো বীজ তোমায় ডাকি
মেলো তোমার সবুজ আঁকি
নীলাকাশে সোনার আলোক শুরে।
ফুল কলি সব কথা শোনো
কেনো মিছে সময় গোনো
কচি বুকের কুসুম তাপে
রাঙ্গা ফুল ফুটোরে।
আমরা ফুল ফুটাইরে।

সকাল বেলা। মিহি মিহি বাতাস বইছে। বাতাসে আমের বোলের মিঠে ঘেরান। হাওয়ার বুকে কেঁপে কেঁপে কচি কণ্ঠের সুর ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। সুরে সুরে ফাল্গুনের পাহাড় হেসে ওঠে। তরুণ রাঙ্গা সূর্যটা বাচ্চা ছেলের মতো লাফায়। ফিঙ্গে পাখিটা আমলকির আগডালে বসে কালো লেজখানা নাচায়।

রাহমান সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠলেন হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে। ইস্ সাতটা বেজে যায়। উঠতে গিয়ে খেয়াল হলো। ক্ষুধায় তাঁর পেটের ভেতর ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে। মাথাটা লাট্টুর মতো চক্কর খেলছে। আবার স্টীলের কঠিন ফ্রেমের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। গোটা রাত ধরে পরিশ্রম করেছেন। কঠোর পরিশ্রম করেছেন। চিন চিন করছে মগজ। উঠে তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচ মুছে আলমারীর ভেতর রাখলেন। পরীক্ষা করা বীজ প্রাণগুলোও যত্নের সাথে প্যাকেট করলেন।

ছেলেরা কোরাস গলায় গান গাইছে। 'আমরা ফুল ফুটাইরে' গানের

একেকটা কথা রাহমান সাহেবের কানে টোকা দিয়ে মনের ভেতর গিয়ে বাজে। বাতাসে আমের বোলের ম ম ঘেরান, বাতাসে কচি কণ্ঠে কোমল গান। রাহমান সাহেব কাল থেকে কিছু যে খাননি ভুলে গেলেন। ঠোঁটে একটা মধুর হাসি জাগলো। মনে মনে বললেন, হাঁ ফুল ফোটাবার জন্যই তো আমাদের এ সাধনা। যতোবার কানপাতেন বাতাস ভেজানো সুর বুকের ভেতর সোনার জলের মতো খেলা করে। আমরা ফুল ফুটাইরে মনে মনে বলেন, তাতো বটে। ফুল ফোটাবার স্বপ্ন আছে বলেই তো কচি গলায় কোমল গান রাঙ্গা ঝরোনার নাহান নেচে ওঠে। গানের সুরে সুরে মাথায় টাক পড়া বিজ্ঞানী রাহমান সাহবের মনেও নানা রকম মিষ্টি স্বপ্ন ভীর করে, জটলা পাকায়।

রাহমান সাহেবের মনে স্বপ্ন আছে। থরে থরে সাজানো। তাই বলে তিনি রোগী মানুষের মতো স্বপ্নের ভেতর ডুবে থাকেন না। ও তাঁর স্বভাব নয়। তিনি বিজ্ঞানী। নিয়মের কঠিন শেকলে বাঁধা তাঁর জীবন। স্বপ্ন থাকলে তো হবে না শুধু। মনের ভেতর ফুলের মতো ফুটে থাকা সুন্দর স্বপ্নটিকে প্রতিদিনের নিয়মিত পরিশ্রমে মাটিতে রোপন করতে হবে। তাতে জাগাতে হবে প্রাণ। বাড়িয়ে তুলতে হবে একটু একটু করে। তিনি বিজ্ঞানী। অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়। সব সময় নিয়ম মেনে চলেন। একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। দেয়ালে বিজলি বাতির সুইচ বোর্ডে হাত দিলেন। বোর্ডে অনেকগুলো বোতাম। টিপ দিলেই জ্বলবে দূরে কোথাও আলো। বিজুলীর শিরা লতিয়ে লতিয়ে নানা জায়গায় চলে গেছে। কোনোটা মাঠে। কোনোটা চারা ভাণ্ডার, পড়ার ঘর, বক্তৃতা কক্ষ, রিয়্যাকটর দালান, আনাচে কানাচে নানা জায়গায়। কাউকে ডাকার দরকার হলে নীরবে বোতাম টিপেন। যাকে ডাকেন সে ঘরে নীল আলো ঝলসে ওঠে। সে মোটা পর্দা সরিয়ে চুপি চুপি সামনে দাঁড়ায়। এটিই নিয়ম। রাহমান সাহেব টিপলেন একটা বোতাম।

অল্পক্ষণ পর। ফর্সাপানা সুন্দর চেহারার একটা ছেলে ঘরে ঢুকলো। সুন্দর তাজা চেহারা। গায়ের রঙ আপেলের নাহান। টিকালো নাক। টানা টানা দু-টি চোখ, কালো চঞ্চল আর মায়াময়। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। চোখ বুজে আছেন রাহমান সাহেব। কোনো শব্দ নেই। দেয়াল ঘড়ির পেন্ডুলামটা ওপরে দুলছে। শব্দ আসছে টিকটিক। টিকটিক। ছেলেটি শব্দ না হয় মতো গুটি গুটি পায়ে রাহমান সাহেবের সামনে এসে দাঁড়ালো। চুপ করে থাকে। আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়ে। পাছে স্যারের চিন্তায় বাধা পড়ে।

চোখ খুললেন রাহমান সাহেব। ছেলেটা রাহমান সাহেবের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকে। তরুন সূর্যের মতো দু-টো চোখ। রাহমান সাহেব ডাকলেন।

বোরহান

- রোজকার সব কাজ সেরেছো সকলে?

– হ্যাঁ স্যার পদার্থ বিদ্যার নিয়ম তিনটে মুখস্ত করেছি। রঙের রসায়নের পরীক্ষা দু-টো করে ফেলেছি। গতকালকের পরীক্ষা করা বীজগুলোতে শিশির মাখিয়ে সূর্যের রাঙাতাপ লাগিয়েছি। রিয়্যাকটরটা দু-দুবার চালিয়ে দেখেছি। প্লাটিনামের পাইপগুলো আপনি যেমন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অবিকল তেমনি করে জোড়া লাগিয়েছি। সকলে একেক লাইন করে একটা লম্বা গান বেঁধেছি। মনসুর হাতে সুর চড়িয়েছে। প্রাণটা নেচে উঠে এমন সুর। আপনি শুনবেন স্যার? আনন্দ আর উৎসাহে বোরহানের টানা দু-টি চোখ নেচে উঠলো যেনো।

রাহমান সাহেব বললেনঃ

–তোমাদের গান, সে তো শুনবোই। অমন কোমল প্রান জুড়োনো গান শুনবো সে তো আমার ভাগ্য। তোমাদের গানের সুরে সুরে বীজেরা অঙ্কুর জাগায়, গাছেরা ফুল ফোটায়। কঠিন মাটির বুক মমতায় মধুর হয়। বাতাস দেয় সাড়া, আমি ও তোমাদের গান শুনবো বৈকি।

–এখখুনি সকলকে এখানে নিয়ে আসি স্যার? খুশীর চোটে বোরহান নেচে উঠলো।

– তা একটু পরেই হবে। এখন আমাকে গাছপালার খবরটবরগুলো দাও।

– সে খবর জানাতে তো দু দু'বার এলুম। দেখি আপনি চোখ বুঝে আছেন তাই ডাকিনি। রাহমান সাহেব বললেনঃ

–খুব ভালো করেছো। ভাবনারা বড়ো লাজুক কিনা। ডাকলে আবার পালিয়ে যেতো। সমুদ্রের কাঁকড়ার মতো। ধরতে গেলে হারিয়ে যায়। ভাবনা হারানোর মতো দুঃখের কিছু নেই। ভাবনাই তো সব কিছুর মূল। ধরো তোমার মনে একটা ভাবনা এলো। তা তুমি বেঁধে ফেলো। সত্য কিনা পরখ করে দেখো, না করলে ঠকবে। অনেক সময় মিথ্যে ভাবনা ও আসে, সত্য ভাবনা থেকেই আসে বিজ্ঞান। ও হলো বিজ্ঞানের প্রাণ রস। তোমার গানের সুরে সুরে যে সুন্দর প্রাণ দুলে ওঠে, স্বপ্নের মতো যার রঙ ভাবনার সে স্বপ্নকে মাটিতে পুঁতে দেয়া সহজ কথা নয়। আমরা বীজ আর চারা গাছের জগতে আনতে চাই একটি বিপ্লব। সবকিছুর জন্য চাই বলবান একখানা ভাবনা। ভাবনার বলেই সবকিছু বেড়ে ওঠে। এর পেছনে দুনিয়ার অনেক মানুষ কঠোর পরিশ্রম করেছেন বলে আজকে বিজ্ঞানের এতো উন্নতি।

আমাকেও এমনি একখানি ভাবনা ডুবিয়ে রেখেছে বইয়ের পাতায়। তাড়িয়ে নিয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। মাটি, বীজ, চারাগাছ নিয়ে কতো

বছর পরীক্ষা নীরিক্ষা করে কাটিয়ে দিলাম। এক সময়ে আমিও ছিলাম তোমাদের মতো। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে আমিও ছিলাম শিশু, গাছের সঙ্গে লতার বিয়ে দিতাম। একা একা বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম। চারাগাছের নরোম ডগায় সবুজ প্রান কেঁপে উঠতে দেখে প্রানটা জানি কেমন করতো। পাতার শর শর আওয়াজে কি কথা শুনতে পেতাম যেনো।

বোরহান একটু আশ্চর্য হলো। স্যার কোনোদিন এতো কথা বলেন না। মনে মনে ভাবে। স্যারও বালক কালের কথা ভুলতে পারেন নি। হঠাৎ রাহমান সাহেব শুধিয়ে বসলেন।

–আচ্ছা বোরহান আজ পর্যবেক্ষণ বাগানের গাছগুলোর গোড়ায় পারমানবিক ট্যাবলেট, মিকশ্চার আর আগায় আলোক স্নান দেয়া হয়েছে তো,

–না স্যার এখনো হয়নি।

–ন'টা বেজে যায় এখনো হয়নি।' তাঁর কণ্ঠস্বরটা করুণ শুনালো, দেখছি তোমাদের দিয়ে বেশী কিছু হবেনা। কতোবার বলেছি, যেখানে নিয়ম নেই, সেখানে বিজ্ঞান নেই। এতো ভুলো মন তোমাদের। সব ভুলে যাও। মনে রেখো বাপু ভুলচুক বিজ্ঞানে অচল। ওই একদোষ তোমাদের। গান পেলে সব ভুলে যাও। গান যদি ভালোবাসা না শেখায়, মন কাদার মতো নরোম করে না দেয় কি লাভ গান পেয়ে? গাছগুলোকে অভুক্ত রেখে কেমন দিব্যি সকলে গান গেয়ে চলেছো। আমি বলছি ওটা ভালো নয়। নিজেদের গানে মজে থাকলে গাছের শিরায় শিরায় যে গান সবুজ হয়ে ফুটে জানবে কেমন করে? আকাশের সূর্যের আলো আর তাপ হতে তরুলতা সংগ্রহ করে প্রাণের কথা। সূর্য অনেক বড়ো। সে চলে নিজের নিয়মে। গাদাই লস্করী চালে। অনেক তার কাজ। ন'টি গ্রহে বিলাতে হয় তাপ, বিলাতে হয় আলো। সূর্যের ওপর ছেড়ে দিলে গাছপালা আমাদের ইচ্ছে মতো বাড়বেনা। সব সময় মনে রেখো আমরা কৃষি কাজে আনতে চাই একটি বিপ্লব।

তাইতো রিয়্যাক্টর বসিয়েছি। ঐ যে পারমাণবিক রিয়্যাক্টর ওটা হলো গিয়ে একটা ক্ষুদে সূর্য। হোক ছোটো। তবু রিয়্যাকরৈ দিনে রাতেসমানে চালিয়ে ওঠা থেকে জীবন নিয়ে গাছপালার জীবনকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তোমরা বলতে পারো সূর্যের ছোটো ভাইটিকে আমরা বেঁধে রেখেছি। যাও তাড়াতাড়ি পর্যবেক্ষণ বাগানে ট্যাবলেট, মিক্শ্চার আর আলোক স্নান দেবার ব্যবস্থা করো গে। আমি আসছি।

কথা বললো বোরহানঃ

–স্যার আপনি কাল থেকে তো কিছু খাননি।

– সে পরে হবে খন। আগে গাছপালাকে খাওয়াই। পরে নিজে খাবো। যাও জলদি যাও-আমিএসব গোছগাছ করে আসছি।

সাদা বাড়িটার চারদিকে পর্যবেক্ষণ বাগান। ছোট্ট নদীটির তীরের ছোটো টিলাগুলো ট্রাকটর দিয়ে গুড়ো করে সমতল বানিয়ে বাগান করা হয়েছে। একদিকে তরিতরকারি, লাউ কুমড়ো, শশা, টম্যাটো, ওলকচু আরো নানা তরি-তরকারির ক্ষেত। অন্য দিকে ফলের বাগান। আনারস, কলা, আঙ্গুর, কমলা, পেপে দেশ বিদেশের কতো চেনা অচেনা ফলের গাছ। সারি সারি। সবুজ ফল ঝুলে আছে থরে থরে। চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কোণার দিকে ফুলের বাগান। গোলাপ, বেলী জুঁই, চামেলী, লাইলাক, ডালিয়া, ক্রিসেন মথিমাস কতো আকারের, কতো রঙের ফুল। ফুটে গেছে কোনোটা। কোনোটা ফুটি ফুটি করছে। কোনোটা এখনো কলি। বাতাসে ভুর ভুর গন্ধ ছুটছে।

পূবের পাহাড়ের চুড়ো ছাড়িয়ে তরুণ সূর্য আগুনের বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে আরো ওপরে উঠছে। রাহমান সাহেবের খামারের ছেলেরা পারম-াণবিক রিয়্যাক্টরটা স্টার্ট দিয়েছে। আসমানে ওঠেছে চড়চড়ে রোদ। রিয়্যাক্টরের গা থেকে বেরিয়ে আসা সরু সরু প্লাটিনামের পাইপগুলো নিয়ে ছেলেরা মাঠময় ছুটোছুটি করছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তদারক করছেন রাহমান সাহেব। রোদের ছটা লেগে চক্‌চক করছে মাথার টাক। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলছেন। হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার সে। ট্যাপ খোলা রাখবেনা। মিটারের দিকে দৃষ্টি রাখো সব সময়। একটুকুও বেশকম না হয় মতো। আমাদের ক্ষুদে সূর্য নাগাল না পায় যেনো। ওলকচু গাছের গোড়ায় ঢেলে দাও একটু মিক্‌শ্চার। কমলা গাছের গোড়া খুঁড়ে শেকড়ের ভেতর দুটো ট্যাবলেট রাখো। বসরা গোলাপের গাছটিতে দাও নীল আলো। ফুলকপি গাছে দেবে হলুদ আলো। মিটারের দিকে খেয়াল করো। বন্ধ করবে দশের দাগ পেরোবার আগে। আর এদিকে দেখো সূর্যের মিতা সূর্যমুখীকে সূর্য ভুলে গেছে। তাই বলে আমরা ভুলবো কেনো। দাও বেচারির কলিগুলো ফুটিয়ে দাও। গোড়ায় মিক্‌শ্চার দাও, ট্যাবলেট দাও। আর কলিগুলোতে আলতো হাতে ছড়িয়ে দাও সোনালী আলো।

রিয়্যাক্টরটা চলছে। হিস হিস শব্দ হচ্ছে। ক্ষুদে সূর্যের বুকের ভেতর জীবনীশক্তি ফোঁসাচ্ছে। ছেলেরা প্লাটিনামের ট্যাপ খুলে ধুসর তরল একরকম পারমাণবিক মিকশ্চার ঢেলে দিলো সাবধানে ওলকচু গাছের গোড়ায়। কমলা গাছের গোড়ায় গর্ত করে দু'টো ট্যাবলেট রাখলো। আরেকটা ট্যাপ খুলে ছড়িয়ে দিলো পাউডারের মতো নীল পরমাণুর কণা। ফুলকপির ফুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো হলুদ আলো। এ আলো ছড়ানোর কাজটিকে ওরা বলে পারমাণবিক আলো স্নান। গাছপালা সূর্য থেকে এক মাসে যে জীবন কণা সঞ্চয় করে-দু'মিনিটের আলোক স্নানে অতোটুকু পুষ্ট হয়ে ওঠে। মাটি থেকে

উপযুক্ত খাদ্য পায়না বলেই ওরা ধুসর তরল পারমাণবিক মিকশ্চার তৈরি করেছে। সেটায় দেয়া হলে শিরাগুলো কেঁপে ওঠে। শক্তির উত্তেজনায় হলপল করে বেড়ে ওঠে গাছপালা। সাদা সাদা ট্যাবলেটগুলো বহু গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছে। গাছের মধ্যে অনেকগুলো রোগী গাছ আছে। ওরা সূর্য থেকে আলোর কণা কেড়ে নিতে পারে না। দুর্বলতার কারণে মাটি থেকে রস টানতে পারে না। সে সব গাছের জন্য হলো ট্যাবলেট। রোগীর যেমন পথ্যি। সূয্যের মিতা সূর্যমুখী গাছের গোড়ায় মিক্শ্চার, শেকড়ে ট্যাবলেট এবং কলিতে দেয়া হলো সোনালী আলো।

রাহমান সাহেব আবার বলিলেনঃ

- হুঁশিয়ার- হুঁশিয়ার সে-বন্ধ করো ট্যাপ। পরমাণুর কণা যেনো নাগাল না পায়। কাছে পেলে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে। নাকমুখের- প্লাটিনামের আবরণ ঠিক করে রাখবে। ছেলেরা সকলে শৃঙ্খলার সাথে লাইন বেঁধে রাহমান সাহেবের পাশে এসে দাঁড়ালো এরি মধ্যে সূর্যমুখীর ছোট ছোট শুকনো প্রায় কলিগুলো ফুটে গেলো। ফুটলো গোলাপের কুঁড়িগুলো। পদ্মফুলের মতো ইয়া বড়ো। একেকটা গোলাপ। আর গন্ধও তেমন। তেমনি লাল। চোখের মণি ধরে টানে। ঝটপট ওলকচু গাছের কোলের ভেতর থেকে ছাতার মতো কোমল কচি একটা পাতা জেগে উঠলো। ফুলকপির ফুলগুলো ভাঁপের পিঠের মতো ফুলতে থাকলো। ছেলেরা অবাক হয়ে দেখছে গাছপালার দেহে পারমাণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া। তাদের কচি কচি বুকগুলোতে সে কি দুরন্ত উত্তেজনা। যাদু বটে। আজব যাদু। রাহমান সাহেব বসরা গোলাপ ফুলটির দিকে তাকিয়ে কি ভাবছেন। কি ভাবছেন? ভাবছেন ছেলেবেলা থেকে এই ফোটা গোলাপটির মতো একখানি সুন্দর স্বপ্ন তাকে ছুটিয়ে নিয়েছে। গোলাপটির নরোম তুলতুলে গায়ে সে স্বপ্নখানিই যেনো ধরা পড়েছে।

তারপর ছেলেরা রাহমান সাহেবের পেছন পেছন বক্তৃতা কক্ষে এসে হাজির হলো। হল ঘরে পঞ্চাশটি কচি কণ্ঠের কোমল কিচিরমিচির। জানলা দিয়ে দেখা যায় রাঙ্গামাটির লতানো পথ রেখা। পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নদীর ধার অবধি চলে গেছে।

রাহমান সাহেব বক্তৃতা মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেলো ছেলেদের কলকাকলী। কাগজ পেন্সিল নিয়ে তারা তৈরি থাকলো। রাহমান সাহেব জানালার ফাঁক দিয়ে একবার বাইরে দিকে তাকালেন। তাঁর স্বপ্নভরা তরুণ সূর্যের মতো দু-চোখ দিয়ে অনেক দূরের জিনিস দেখতে পান যেনো। তাঁর চোখ দু-টো ছেলেদের স্বপ্নের উৎস। যা হোক তিনি বলতে থাকেন। তাঁর প্রতিটি কথা শোনার জন্য পঞ্চাশ জোড়া কান উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

একটি কথাও হারাতে চায় না। কারণ রাহমান সাহেবের প্রতিটি কথার সঙ্গে মিশে রয়েছে বিজ্ঞান। আর বিজ্ঞান মানেইতো সত্য। তিনি বললেন;

-"কোনো কিছু সম্বন্ধে জানতে হলে তার গোড়ার কথা জানারও প্রয়োজন আছে। সেটি হলো তার ইতিহাস। পারমাণবিক শক্তিকে কৃষি কাজে প্রয়োগ করার পেছনের ইতিহাসটুকু বলছি।" ছেলেরা কান খাড়া রাখলো। দরকারি কথা টুকে নেয়ার জন্য কাগজ পেন্সিল তৈরি থাকলো। রাহমান সাহেবের একটা কথাও বেফজুল নয়। মিথ্যে নয় একবর্ণও। একটু থেমে আবার বলে যেতে লাগলেন রাহমান সাহেব।

- দুনিয়ার লোভী মানুষদের মধ্যে আবার একটা লড়াই বাধলো। একদিকে জাপান, জার্মান অন্যদিকে গোটা পৃথিবী। একে বলা হয় দ্বিতীয় মহাসমর। দু'দলের সৈন্যরা যুদ্ধ করছে ভয়ঙ্কর। আকাশে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে মাটিতে। যুদ্ধ চলছে সাগরে। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গিয়ে বোমা পড়ছে বুম বুম। মানুষ মরছে দলে দলে। বিজ্ঞান মানুষ মারার জন্য যতো রকম ভয়ঙ্কর অস্ত্র তৈরি করেছে। সবগুলোর ব্যবহার হতে লাগলো। দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ এলো। জোয়ান মানুষগুলো লড়াইয়ের ময়দানে মরতে লাগলো। এতিম আর বিধবাতে পৃথিবী ভরে গেলো। কতো ছেলে বাবা হারালো সীমা নেই।

একটা ছেলে প্রশ্ন করলো-

- স্যার একটা কথা।

- কী? একটু থামলেন রাহমান সাহেব।

- বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মারার অস্ত্র কেনো তৈরি করে? যুদ্ধ তো খুব খারাপ। মানুষ যুদ্ধ করে কেনো?

- তাহলে কেনো, লোভী মানুষেরা বিজ্ঞানীদের জোর করে আটকে রেখে, তাঁদের দিয়ে ভয়ঙ্কর সব অস্ত্র তৈরি করায়। অপরের জিনিস কেড়ে নেয়ার জন্যই লোভী মানুষেরা লড়াই করে। পৃথিবীর শুরু থেকেই লোভী মানুষেরা এই লড়াই করে আসছে ।

- তা কি ভালো স্যার? ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করলো।

- না মোটেই ভালো নয়। যুদ্ধ কখনো ভাল নয়। কিন্তু লোভী মানুষেরা লড়াই করে। যতোদিন লোভ করবে, ততোদিন লড়াইও চলবে। যাহোক শোনো। আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা আর নাগাসাকি শহরে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলে দিলো। জাপান ধলো বাওটা উড়িয়ে দিয়ে বললো আমরা আর যুদ্ধ চাইনে। পরাজয় মেনে নিলাম। এতোবড়ো মহাযুদ্ধ দুটো মাত্র পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে থেমে গেলো। দুটি শহরে কিচ্ছু নেই। পারমাণবিক বোমার আগুন সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে

দিয়েছে। সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। মানুষ জন পুড়ে কয়লার মতো হয়ে পড়ে আছে। মাংস পচা গন্ধে টেকা যায় না পশু-পাখি খাঁচার টিয়ে সব মরে গেছে। দালান-কোঠা, ইস্টিশান, রাস্তা-ঘাট, ঘুরে বেড়াবার পার্ক সব ধ্বংস হয়ে গেছে। সে খবর বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়লো পৃথিবীতে। পারমাণবিক বোমার ধ্বংসের ক্ষমতা দেখে বিজ্ঞানীরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মহা বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তো কেঁদেই ফেললেন।

-আইনস্টাইন কে স্যার? শুধোলো আরেকটি ছেলে।

- তিনি হচ্ছেন একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী। বড়ো হলে তোমরা তাঁর অনেক আবিষ্কারে কথা জানতে পারবে। তিনি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন ওর নাম হলো আপেক্ষিক তত্ত্ব। আরেকদিন সে বিষয়ে বলবো। এ আপেক্ষিক তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই বানানো হয়েছিলো পারমাণবিক বোমা। জাপানের ধ্বংসলীলার কথাশুনে মহান বিজ্ঞানীর মন ভরে গেলো ব্যথায়। দুষ্টু লোকেরা বোমা বানিয়ে মানুষ মারবে এজন্যই কি তিনি পরিশ্রম করেছেন এতো। চোখের সামনে বোমার আগুনে পোড়া আধপোড়া মানুষদের ছবি ভেসে উঠলো। দু দিন তিনি কিছু খেতে পারলেন না। তাঁর মুখের সুন্দর শিশুর মতো হাসিটি নিভে গেছে। বাচ্চা ছেলের মতো গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সে যাক পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলা দেখার জন্য জাপানে এলেন একদল বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীরা কান্নাকাটি করার মানুষ নন। বিপদ যতোই বড়ো হোক মাথা ঠিক রাখতে হবে। জাপানের ঘরবাড়ি তছনছ। মানুষ মরে পচে আছে। আকাশে শকুনও নেই। অবস্থা দেখে ক'জন কোমল প্রাণ বিজ্ঞানী তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ যেনো ঠিক মানুষের লোভের আগুন।

বিজ্ঞানীরা মাঠ, ফসল, জীবজন্তু, মানুষের শরীরে পারমাণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া পরখ করতে লাগলেন খুটিয়ে খুটিয়ে। কিছুই পেলেন না। ক'জনের প্রাণ তো হাঁফিয়ে উঠলো। একই দৃশ্য আর কতোদিন দেখা যাবে। কিন্তু তিনজন বিজ্ঞানী ভরসায় বুক বেঁধে পরীক্ষা কার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। দুনিয়ার তাবৎ অমঙ্গলের মধ্যেই তো থাকে মঙ্গল। ধ্বংসের মধ্যেই তো থাকে সৃষ্টির কোমল অঙ্কুর। তাঁরাও বিশ্বাস করলেন কিছু একটা পেয়ে যাবেন।

অবশেষে একদিন। হিরোসিমা শহর থেকে একটু দূরে। মাঠ দিয়ে ফিরছিলেন বিজ্ঞানীরা। সে মাঠে ফসল বলতে কিচ্ছু নেই। বোমার আগুনের ছটায় সব জ্বলে পুড়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা কিছু দূরে এসে দেখলেন এক আশ্চর্য জিনিস। এক জায়গায় দেখতে পেলেন ঘাস নল খাগড়ার মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। চেকন চেকন পাতাগুলো বাতাসে দুলে দুলে প্রাণের বিজয় বার্তা ঘোষণা করেছে। তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। কোত্থেকে এলো নলখাগড়ার

মতো ঝাঁকড়া ঘাসের বন। সকলে পনেরো দিন আগেও এপথ দিয়ে গেছেন। কিছুই তো দেখেন নি। ধ্বংসলীলার ভেতরে এমন সবুজ তাজা প্রাণ এলো কোত্থেকে? এলো কোত্থেকে? তাঁরা ক্ষেতের ধারে গিয়ে বসলেন। ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন নলখাগরা নয়। ও হলো গিয়ে দুর্বার মতো এক ধরনের ঘাস। হঠাৎ কোনো কারণে বড়ো হয়ে গেছে।

তারপর শুরু হলো বিজ্ঞানীদের কাজ। তাঁরা জাপানীদের জিজ্ঞেস করলেন, উদ্ভিদ বিদ্যার বই ঘেঁটে দেখলেন। জাপানীরা কিছু বলতে পারলেন না। বইতেও কিছু লেখা নেই। তাহলে এমন সৃষ্টি ছাড়া ঘাস এলো কোত্থেকে। একজন বিজ্ঞানী তার সমাধান করে ফেললেন। তিনি বললেন, আসলে এগুলো ঘাসই, পারমাণবিক বোমার প্রতিক্রিয়ারই কারণে অমন বড়ো হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের প্রথম চেতনা হলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন পারমাণবিক শক্তিকে কৃষিকাজে প্রয়োগ করা যাবে।

তারপর থেকে এ নিয়ে কতো গবেষণা হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে। গবেষণার সুফলও ফলতে আরম্ভ হয়েছে। রুক্ষ মরুভূমিকে সবুজ করে তোলা হচ্ছে। আগে যেখানে গরম বালু রাতদিন জ্বলতো এখন সেখানে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে সবুজ। প্রাণহীন মরু ফিরে পেয়েছে প্রাণ। গোবীর মরুভূমিতে দুলছে সোনালী গমের শীষ। সাইবেরিয়ার তুষার ঢাকা মাঠে গানের কলির নাহান জাগছে প্রাণের অঙ্কুর। শুধু কৃষিকাজে নয়, রোগ আরোগ্য করার কাজেও চলবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার। তোমাদের নিজেদের চেহারাগুলো আয়নাতে তাকিয়ে দেখো। আমরা পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে কি অসাধ্য সাধন করে ফেলেছি। পাকা টম্যাটোর মতো গায়ের রঙ এতো পেয়েছো পারমাণবিক শক্তির কল্যাণে।

আরো কিছু বলতে যাচ্ছেন রাহমান সাহেব। এমনি সময়ে দারোয়ানকে দেখে বিগড়ে গেলো তাঁর মেজাজ। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি কাউকে সহ্য করতে পারেন না। চীৎকার করে উঠলেনঃ

- কী চাই?

- স্যার একটা বুড়ো আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ভয়ে ভয়ে বললো দারোয়ান।

- বুড়ো? বুড়োকে নিয়ে আমি কি করবো? বলে দাও দেখা হবে না।

- স্যার বুড়োটি তিনদিন থেকে আসছে। প্রতিদিন আমি বলেছি দেখা হবেনা। ও নাকি আপনাকে চেনে। দেখা না করে নাকি যাবেই না।

- মহা মুশকিল দেখছি। যাও নিয়ে এসো। দারোয়ান চলে গেলো। তিনি আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। বুড়োরা স্বপ্ন দেখেনা। বুড়োরা ভীতু আর খিটখিটে। খালি উপদেশ দেয়। তাদের দিয়ে আমি কি করবো?

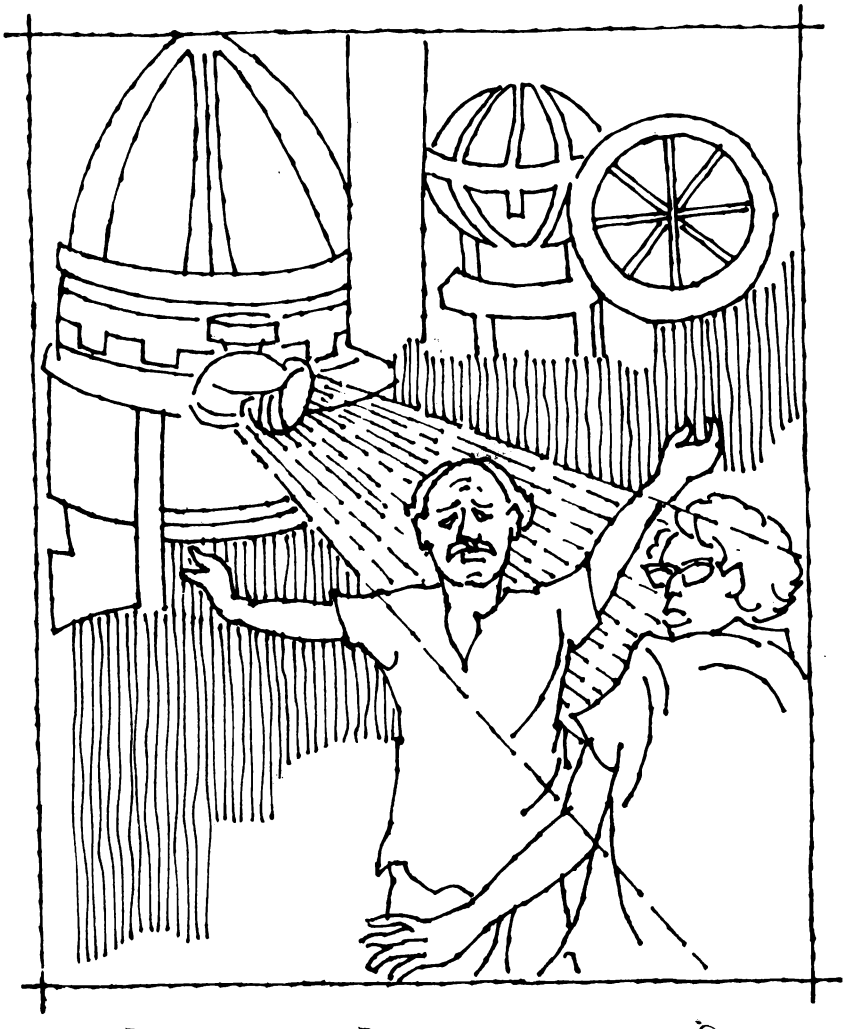

একটু পরে দারোয়ান একটা বুড়ো মানুষকে বক্তৃতাকক্ষে নিয়ে এলো। বড়ো শীর্ণ আর মলিন চেহারা বুড়োর। অনেক বয়স, মুখে বাঁকা চোরা রেখা। পরনে একখানা ধূতি। গায়ে একটা ময়লা পাঞ্জাবী। তাও আবার জায়গায় জায়গায় ছিড়ে গেছে। রোদের মধ্যে হেঁটে এসে হাঁফাচ্ছে। বুড়োর চোখ দুটো কিন্তু বড়ো স্বপ্নময়। আকাশের সন্ধাতারার মতো। অবাক হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। কাঁচের আলমারির ভেতরে বাঁকা তীর্যক, সরু নল, মোটা নলের, লোহার, পেতলের, তামার, কাঁচের নানারকম যন্ত্রপাতি দেখতে লাগলেন। বাইরের ফোটা ফুলের দিকে চেয়ে কথা বলতে ভুলে গেলেন। বুড়োটি যেনো স্বপ্নরাজ্যে চলে এসেছে।

রাহমান সাহেব বিরক্ত, হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনার কিসের দরকার? তাড়াতাড়ি বলুন, বলে ফেলুন।

বুড়োটি রাহমান সাহেবেব মুখের পানে তাকালেন। ভালো করে তাকালেন চোখ, মুখ, নাক, কান, চুল সবকিছু। বিড়বিড়িয়ে বললেন, 'রাহমান বদলে গেছে। অনেক বদলে গেছে। আগে একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল ছিলো মাথায়। এখন টাক পড়েছে। সে একহারা চোহারার শান্ত ছেলেটি নেই, রাহমান।' তিনি কথা বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ ঠেলে পানি আসছিলো।

রাহমান সাহেব বললেন,

- কি বলবেন, তাড়াতাড়ি বলুন। মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন না। এবার বুড়ো আর চোখের পানি সামলাতে পারলো না। দুগাল বেয়ে দরদরিয়ে নেমে এলো পানি। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,

-রাহমান তুই আমাকে চিনলিনে? আমি তো তোর শিক্ষক সারদা .....

- সে কি স্যার আপনি! নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নিলেন। ছেলেদের ডেকে বললেন। আমার স্যার এসেছেন দয়া করে। আজ তোমাদের ছুটি।

গোসল সেরে সারদা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে রাহমান সাহেব খেতে বসলেন। অনেক বছর পরে ছাত্র শিক্ষকের দেখা হয়েছে। রাহমান সাহেব সারদা বাবুর পাতে রুই মাছের মুড়োটি তুলে দিয়ে বললেন,

- স্যার আপনি একেবারে বুড়ো হয়ে গেছেন।

- হ্যাঁ বাবা বুড়ো হয়ে গেছি। তুইও তো আর খোকাটি নেই। মাথায় একটা মস্তোবড়ো টাক পড়েছে। কেমন সুন্দর চাঁপা কলার ঢেউ খেলানো শেকড়ের মতো নরোম চুল ছিলো তোমার মাথায়। রাহমান সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

- আপনি এখনও সে স্কুলেই আছেন না স্যার? জিজ্ঞেস করলেন রাহমান সাহেব। জবাব দিতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন সারদা বাবু।

- না রে বাবা আমি আর সে স্কুলে নেই। আমি নাকি ছেলেদেরকে বাজে কথা শেখাই। গ্রামার এ্যালজ্যাব্রার কথা বলিনা। ছেলেরা পাশ করেনা। তাই কমিটি আমাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে।

- সে কি স্যার! আপনাকে বাজে কথা বলে বললো? গ্রামার এ্যালজ্যাব্রার কথা তো সকলে বলতে পারে। কচি মনের ভেতর আপনার মতো স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে পারে কজন? আপনিই তো হাইস্কুলে পড়ার সময় আমার ভেতর উদ্ভিদ জীবনের নির্বাক স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। সে জন্যেই তো আজকের কৃষি খামার আর গবেষণাগার গড়ে উঠেছে। যা দেখছেন তার মূলে তো আপনিই।

স্কুল কমিটি আপনার স্বপ্নকে দাম দিলোনা? বুকে উজ্জ্বল তাজা স্বপ্ন না থাকলে পাশ করে কি হবে। এই আমাদের দেশের মানুষ। তারা স্বপ্নের দাম বুঝে না। তিনি আহ্ আহ্ করে আফসোস করলেন।

তারপরে রাহমান সাহেব সারদা বাবুর কাছে অনেক কথা বললেন। অনেক কথায় ভরে রয়েছে বুক। কাউকে বলতে পারেন নি। ছেলেবেলার প্রিয় শিক্ষককে পেয়ে সব কথা মন খুলে বলতে লাগলেন। হাইস্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে এলেন। জীববিজ্ঞান নিয়ে পড়লেন। পাশ করে কৃষি বিদ্যালয়ে গেলেন। সেখান থেকে বৃত্তি নিয়ে গেলেন বিদেশে। দশ বছর থাকলেন- পড়াশোনা আর গবেষণায় মগ্ন। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দিলো ডক্টরেট টাইটেল। তারপরে আরো তিন বছর হাতেকলমে কৃষিকাজে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ শিক্ষা করে দেশে এলেন। সরকারী চাকুরি নিলেন না। বিদেশের মানব প্রেমিক বন্ধুরা তাঁকে নদীর ধারে পাহাড়ি অঞ্চলে এ খামারটা গড়ে দিয়েছেন। তিনি রিয়্যাকটার বসিয়েছেন। ছেলেদেরকে শহরের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে আদর্শ কৃষি বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তোলার কাজে মনপ্রাণ নিয়োগ করেছেন। এক একর জমিতে পাঁচ পাঁচশো মণ ধান ফলানোর ইচ্ছে আছে। অনেক কথা বললেন।

সব শুনে সারদা বাবুর শীর্ণ মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সারা জীবন যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর ছাত্র রাহমানের সাধনায় তা প্রাণ পেয়েছে। এর চেয়ে আনন্দের কিছু আছে নাকি?

খাওয়া দাওয়ার শেষে বিশ্রাম করতে গেলেন। বিকেল বেলা দেখলেন কিভাবে গাছপালা পারমাণবিক শক্তির প্রভাবে চোখের সামনে তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে। মনে আনন্দ ধরেনা। তিনি যেনো শিশু হয়ে গেলেন। কতোদিন পরে ফিরে এলেন নিজের জগতে।

রাহমান সাহেব বললেনঃ

-স্যার আপনি চলে এসে খুবই ভালো করেছেন। এখন থেকে এখানে ছেলেদের সঙ্গে থাকবেন। ছেলেদের মনে ঢুকিয়ে দেবেন তাজা আগুনের মতো উজ্জ্বল উজ্জ্বল স্বপ্নরাশি। আমি শেখাবো বিজ্ঞান। অল্পদিনের মধ্যে গড়ে উঠবে একদল কৃষি বিজ্ঞানী। তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। অভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। অজ্ঞানতাকে তাড়িয়ে দেবে। দেখতে দেখতে দেশের চেহারাই পাল্টে যাবে।

-হ্যাঁরে রাহমান, স্বপ্ন দেবো। কচি বুকে তাজা স্বপ্ন বুনবো। বুড়ো হলেও আমার মনখানা অবিকল শিশু রয়ে গেছে।

তারপরের দিন ঘটলো একটা দুর্ঘটনা। রিয়্যাক্টর স্টার্ট করে রাহমান সাহেব সারদা বাবুকে পারমাণবিক শক্তির খেলা দেখাচ্ছিলেন। একটা পাইপ

রেখে আরেকটা প্লাটিনামের পাইপে হাত দিয়েছেন। ভুলে ট্যাপটা বন্ধ করেননি। রিয়্যাক্টরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ঝলকে ঝলকে তাজা তাজা রশ্মি রাহমান সাহেব কিংবা সারদা বাবু একটু নড়তেও পারলেন না। পারমাণবিক শক্তির তাপে দু'জনই পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন। সামান্য একটু অসাবধানতার জন্য একজন মহান বিজ্ঞানী এবং তাঁর মহান শিক্ষকটি প্রাণ হারালেন।

খামারের ছেলেরা বুক চাপড়ে কান্নাকাটি করতে লাগলো। তাদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপনার মানুষটি আর বেঁচে নেই। দু'জনতো রাহমান সাহেবের শোকে বেহুঁশ হয়ে গেলো। যিনি তাদের জন্য এতো কষ্ট করেছেন, যাঁর ছিলো আকাশের মতো উদার প্রাণ তাঁকে হারিয়ে খামারের ছেলেরা হায় হায় করতে লাগলো। ছেলেরা বাবা মাকে কোনোদিন দেখেনি। রাহমান সাহেব ছিলেন একসঙ্গে বাবা মা দুইই। খামারে শোকের কালো ছায়া নেমে এলো।

বোরহান রাহমান সাহেরেব উপযুক্ত ছাত্র। সে জানে যে ক্ষতি হয়ে গেছে তা পূরণ হবে না কোনোদিন। রাহমান সাহেব তাদেরকে বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাণপাত করেছেন। বিপদ যতোই বড়ো হোক- বিজ্ঞানীর কান্নাকাটি করা সাজেনা। বোরহান ছেলেদের বললো-

- ভাইরা কেঁদে কি হবে। তোমরা চোখের জল মুছে ফেলো। স্যার কি বলেছেন মনে করতে চেষ্টা করো। যা হবার হয়ে গেছে। স্যার আমাদেরকে দিয়ে যে কৃষি বিপ্লব করাতে চেয়েছেন, চল তা করার শপথ নেই। ভয় পাবার কিছু নেই। সারদা বাবুর মতো একজন মানুষের স্বপ্ন থেকে রাহমান সাহেবের মতো বিজ্ঞানী যদি বেরিয়ে আসতে পারে আমরা রাহমান সাহেবের স্বপ্ন বুকে নিয়ে আরো বড়ো বিজ্ঞানী হতে পারবো। তারা কৃষিকাজে একটা বিপ্লব আনার শপথ নিলো। সারদা বাবু এবং রাহমান সাহেবের দু'টি মর্মর মূর্তি বানিয়ে খামারের গেটে বসালো। ছাইগুলো যত্ন করে একটি কাচের পাত্রে রাখলো। এ ছাই আর ও মূর্তি দুটো তাদের অনুপ্রেরণা দেবে চিরদিন।

স্বপ্ন সমুদ্দুর

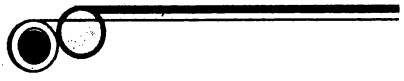

সিরাজ, জাকারিয়া, শামসু, জাফর ওরা চারজন হাসিমপুর ইস্টিশানে গিয়েছিলো। এমনি গিয়েছিলো বেড়াতে। ছোট ছোট পায়ে হেঁটে হেঁটে। ঝিরি ঝিরি হাওয়া, বিকেল বেলা। ভালো লাগে। চারজনের খু-উ-ব ভালো লাগে।

একটু ফুরসত পেলেই চারজনে হুট করে চলে আসে ইষ্টিশান। বাঁশি বাজিয়ে ভোঁস ভোঁস ধোঁয়া ছেড়ে, ঝমঝম আওয়াজ করে এগিয়ে আসে লোহার গাড়ি। এগিয়ে আসে এঁকে বেঁকে বিরাট একটা সাপের মতো। পেটের ভেতরে মানুষ। মেয়ে পুরুষ। বাচ্চাকাচ্চা। দূর থেকে দেখলে চকচকে রূপোর পাতের মতো লাগে। ঝিলিক মারে রোদ্দুরে।

ছোট্ট ইস্টিশান হাসিমপুর। একটা মাত্র রেল লাইন। লোহার হাত উঁচিয়ে ধরা সিগন্যাল নেই কোনো। উত্তরে কাঞ্চননগর দক্ষিণে দোহাজারি দুটোই বড়ো সরো ইস্টিশান। পাঁচ সাতটা লাইন। সব সময় তিনখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উজান- মানে শহরমুখী গাড়ির সঙ্গে দোহাজারীমুখী ভাটি গাড়ির ক্রসিং হয়। লোকে বলে 'আপ ট্রেন' লোকে বলে 'ডাউন ট্রেন'। কতো মানুষ ওঠে কতো মানুষ নামে। কতো দেশে দূর বিদেশে যায়। মালগাড়িগুলো ঘট্টাং ঘট্টাং শব্দ করে দেশান্তরে আনারস, পেয়ারা আরো নানারকম মালপত্তর নিয়ে যায়।

দোহাজারী, কাঞ্চননগর হোকগে বড়ো ইস্টিশান। তার চাইতেও বড়ো আছে। হাসিমপুর ছোট্ট হোক তবুও ভালো। বিল কোণাকোণি কানে বাতাস ধরে মতো একটা দৌড় দিলেই একদম ইস্টিশান। মাঝখানে একটু জিরিয়ে নিতে হয়। সাপের মতো লোহার আঁকা-বাঁকা গাড়িখানা যেমন ইস্টিশানে ঢুকে কয়েকটা আগুন ভরা নিঃশ্বাস ছাড়ে- তেমনি আর কি। তারাও বিলের মাঝ বরাবর কাঁশের ফুলে ফুলে সাদা টিলাটার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ক'টা বড়ো নিঃশ্বাস ছাড়ে। কষ্টের মধ্যে এই। তারপরে একটা দৌড়.....তারপর ইস্টিশান।

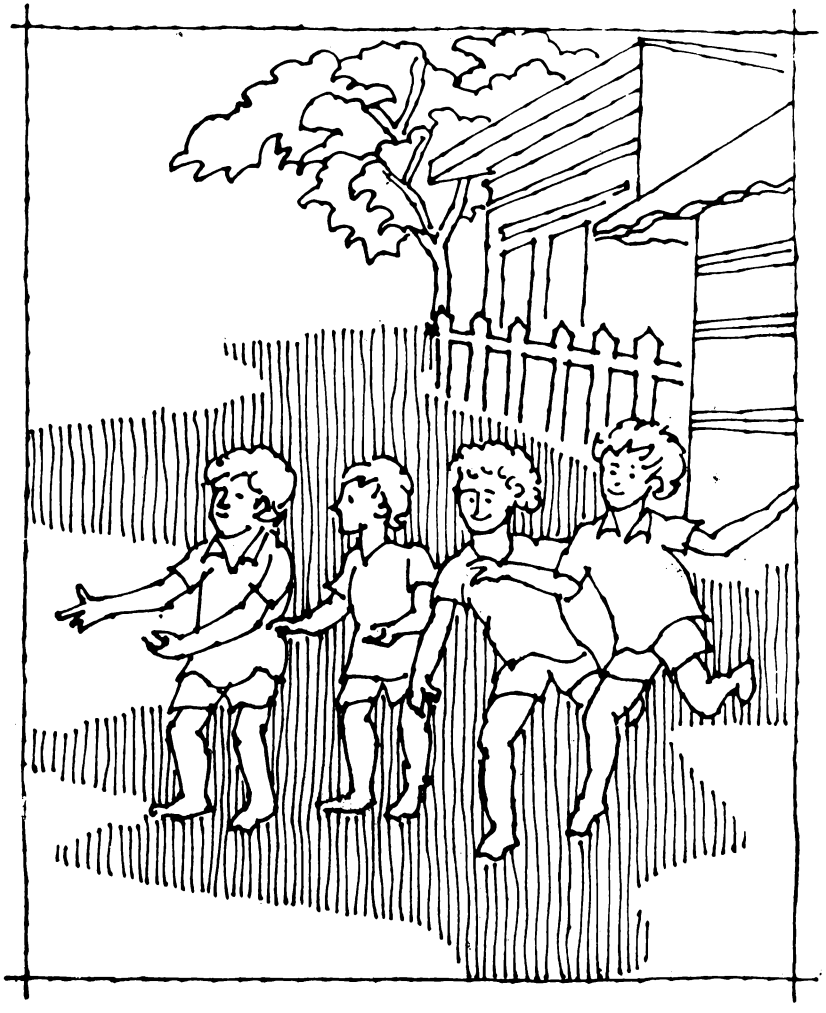

সেদিন আব্বা ঘরে ছিলেন না। তিনি গেছেন খাসমহল। গেলো সনের খাজনা দিতে। আর সুযোগ বুঝে চারজন চলে এলো, গল্প করতে করতে; তর্ক করতে করতে, ঝগড়া করতে করতে একদম ইস্টিশান।

তারাও প্লাটফরমে ঢুকেছে, ঢিং ঢিং ঢিং করে ইস্টিশানের কালো কোট পরা দারোয়ান ঘন্টা বাজিয়ে দিলো। ও বেটা আবার কানে কম শোনে। একবার ইস্টিশান মাস্টার তাকে বাজারে আম কিনতে পাঠিয়েছিলেন। সে পোস্ট অফিস থেকে খাম কিনে নিয়ে এসেছিলেন। ওকে দেখে চারজনের

হাসি পেলো। কিন্তু বেচারার বোকা বোকা মুখখানির দিকে তাকিয়ে মায়া হলো।

তারা চারজন এসে প্ল্যাটফর্মের পেছনে আকন্দগাছের ঝোপের পাশে পা ছড়িয়ে বসলো। শামসু গিয়ে প্ল্যাটফর্মের ঐ দিকের তেকোণা দোকানটার থেকে চার আনার বাদাম কিনে নিয়ে এলো। খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বাদাম খেতে লাগলো চারজন। বাদাম খেতে কেতে জাকারিয়া শামসুকে জিজ্ঞেস করলো,

- 'শামসু ভাই, কচিকাকু এলে হাসিমপুরে নামবে না?'

- হ্যাঁ হ্যাঁ হাসিমপুরেই তো নামবে।' শামসু জবাব দিলো

সে বয়সে একটু বড়ো। মামাদের সংসারের অনেক কিছু বোঝে। ঝগড়াঝাটির কথাও জানে। জাফর আর শামসু তাদের মামাদের বাড়িতে থাকে। সিরাজেরা তাদের মামাতো ভাই। সিরাজের বাবা তার মামা। বড় মামা কচি মামাকে বিলেত যাবার জন্য টাকা দিতে পারেন নি। তাই কচি মামা রাগ করে বাড়ি থেকে চলে গেছে। দু'বছর ধরে বাড়িতে আসেনা। টাকা-পয়সা কামিয়ে নাকি একেবারে বিলেত চলে যাবে। সেখান থেকে একেবারে পড়াশোনা শেষ করে আসবে। সে অনেক বছর লাগবে। জাকারিয়াকে কচি মামা খুব আদর করতো আগে। কচিমামার সঙ্গে ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে ঘুমোতো না জাকারিয়া। এখনও দাদীর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন সে কাঁদে। যখন তখন যাকে তাকে জিজ্ঞেস করবে- 'কখন আসবে কচি কাকু?' আসবেনা বললে কাঁদতে থাকে। আবার জিজ্ঞেস করলো জাকারিয়া। রাতের বেলা এলে আমরা টর্চবাতি জ্বালিয়ে হাসিমপুর থেকে নিতে আসবোনা শামসু ভাই?

- হাঁ, হাঁ তাতো আসরোই। কিন্তু তুমি তখন ঘুমিয়ে থেকো না।

- না আমি কখখনো ঘুমাইনা তোমাদের মতো। আমি শুধু স্বপ্ন দেখি।

- কি স্বপ্ন দেখো?

- স্বপ্ন দেখি কচি কাকু এসে হাসিমপুরে নেমেছে। আর আমার জন্য লালকমল নীল কমলের গল্পের বই এনেছে। আচ্ছা শামসু ভাই, আসেনা কেনো? আমি প্রতিরাত স্বপ্নে দেখি, লালকমল নীল কমলের বই হাতে গাড়ি থেকে নামলো কচিকাকু। চুলের সামনের থোপাটা বাতাসে উড়ছে।

- কচিকাকু আর আসবেও না, চিঠিও দেবেনা। 'একেবারে বিলেত যাওয়ার পর তবে লিখবে চিঠি, তার আগে নয়। এখন নয়, সে অনেক দিন পর।' জাকারিয়াকে কাঁদাবার জন্য বললো সিরাজ।

জাকারিয়ার ছোটো কচি মুখখানা কালো হয়ে এলো। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। চোখের কোণায় বড়ো বড়ো ফোঁটা নামতে লাগলো। শামসু সস্নেহে তার ছোট্ট দুষ্টু মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বললো।

- সিরাজের মিছে কথায় বিশ্বাস করিসনে। দেখবি পিয়ন আজ নইলে

কাল এসে মামার চিঠি দিয়ে যাবে। আসবার আর বেশি দেরী নেই। তুমি মনে মনে আজ কি স্বপ্নে দেখবে চিন্তা করো।

জাফর এখনো খু-উ-ব ছোটো। মাত্র বেবীতে পড়ে। কিচ্ছু বোঝো না। জিজ্ঞেস করলো।

- সিরাজ ভাই বিলেত কোন দেশ?

- সে অনেক দূরের দেশ।

- বড় খালার বাড়ির চাইতে দূর?

- হাঁ রে হাঁ অনেক দূর। সে সাতটি সমুদ্দুর, তেরোটি নদী তার ওপার.....তারপরে বিলেত। চাঁদের চাইতে একটু কাছে হবে আর কি।

-সমুদ্দুর কি সিরাজ ভাই? বোঝে না ত কিছু, তাই অনেক কিছু জানতে চায়।

সিরাজ ভূগোলের ছাত্র। দু'বছর আগে কক্সবাজার গিয়ে কচি কাকুর সঙ্গে সমুদ্দুর দেখে এসেছে। এখন মাস্টারের মতো করে বলতে লাগলো ঠোঁট ফুলিয়ে।

- সে তুমি দেখোনি। এরাও দেখেনি নাম শুনেছে শুধু। সে পানি শুধু পানি- নীল পানি- নোনা পানি- অথৈ পানি- লাল কমল নীল কমলের ব্যঙ্গমা পক্ষী ও উড়ে উড়ে সে পানি ওর করতে পারবে না। নোনা নীল পানিতে ফুটে উঠে- ঢেউ, ঢেউয়ের মাথায় ভাসে ফেনা। তাতে সাদা সাদা রেখা এঁকে কালের জাহাজ ছুটে যায় নানান দেশে। আমি নিজের চোখে দেখছি।

হঠাৎ জাকারিয়া বলে উঠলো.

- আমিও বিলেত গিয়ে বেশ ক'বছর থাকবো। পড়াশোনা শেষ হয়ে যাবে যখন; খুব বড়ো একখানা চিঠি লিখবো। তোমরা আমাকে নিতে এসো। কেমন আসবে তো? তার কথায় ওরা তিনজন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ওরা হাসছে কেন জাকারিয়া বুঝতে পারলো না।

বাঁশী বাজিয়ে লোহার গাড়ীখানা ঘট্টাং ঘট্টাং শব্দ করে প্লাটফর্মে এসে ঢুকলো। এঞ্জিনটা ভোঁস ভোঁস ধোঁয়া ছাড়ছে। ও পাড়ার ইসলাম মিয়া হাতে একটা চিতল মাছ ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নামলো। আবার বললো জাকারিয়াঃ

- চলো শামসু ভাই কচিকাকু এলো কিনা একটু দেখে নিই।

- দেখতে হবে না, আমি যে স্বপ্নে দেখেছি এসেছে।

শামসু বললো,

- চল এমনিতে একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

চারজনে উঠে প্লাটফর্মের এ মাথা ঘোরাঘুরি করলো কয়েকবার। একটি বউ পরনে রেশমী শাড়ী, হাতে সোনার শাখা কেঁদে কেঁদে গাড়ীতে উঠে বসলো। আর একটা লোক আছে সঙ্গে। সেটি বোধহয় স্বামী। খিড়কী দিয়ে মুখখানি বাড়িয়ে দিয়েছে বউটি। নীচে বুড়োমতো একজন মহিলা। সম্ভবতো বউটির মা হবে। গার্ড সবুজ পতাকা দুলিয়ে দিলো। ডেরাইবার হুইশিল

বাজালো বউটি কাঁদলো, মা'টিও কেঁদে ফেললো। গাড়ী ছেড়ে দিলো। বউটির চোখ দুটি মায়ের দিকে, মায়ের চোখ দু'টি মেয়ের দিকে। কিন্তু তাঁর চোখে এসে ধোঁয়া লাগলো এঞ্জিনের। খুব খারাপ লাগলো চারজনের, মা-টির দুঃখ দেখে।

পূব পাড়ার খলু মাতব্বর শহরে সাক্ষী দিতে গেছিলো। মিছে সাক্ষী দিতে খলু ওস্তাদ। ওকে দেখলে জাকারিয়ার গা ডরে ছম ছম করে। সেও নেমেছে গাড়ী থেকে। তাকে দেখে জাকারিয়া আকন্দ ঝোপের আড়ালে লুকোতে যাচ্ছিলো। তার আগে মাতব্বর এসে নাতি নাতি বলে তার কান মলে দিলো। ইস্টিশান মাস্টার কচিমামার পরিচিত লোক। উনার সঙ্গে এলে আগে কতো কিছু খেতে দিতেন। তাদেরকে চেনেন। মাস্টারকে দেখে জাকারিয়া জিগগেস করলো।

- কচিকাকু কখন আসবে বলতে পারেন?

- হাঁ হাঁ আসবে শীগ্‌গির। তোমরা বাড়ী চলে যাও বেলা পড়ে এলো।

তারপর চারজনে হেঁটে হেঁটে রেললাইন ছাড়িয়ে চলে এলো ফরেস্ট অফিসে। ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গেও খুব খাতির ছিলো মামার। লোকটি ভালো ছিলো। বাগান থেকে ফুল ছিঁড়লে ও কিচ্ছুটি বলতেন না। এখন বদলী হয়ে গেছেন।

পাহাড়গুলো মরে শুকিয়ে গেছে। হরিণের মাংসের মতো লাল মাটি সূর্যের আলোতে ঝিলিক দিচ্ছে। ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে। উলুর শাদা শাদা ফুলগুলো বাতাসে হেলছে দুলছে। ধলিবকের পাখার মতো সাদা। কেমন সুন্দর লাগে। সূর্য ঢলেছে অনেকদূর। মেয়েদের আলতা পড়া পায়ের মতো রঙ ধরেছে পশ্চিমের আসমান। ডান দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ির মতো করে বানানো পেঁচানো পেঁচানো হাঁটা পথ বেয়ে নখ ফুটিয়ে ফুটিয়ে নীচে নামতে লাগলো। বরগুইনীর বালুচরে এসে ঘরের দিকে পা বাড়ালো। পাহাড়ের থলিতে এক ঝাঁক বাঁদর- কিচির মিচির করছে। সিরাজ একটা ঢিল ছুঁড়ে মারলো। একটা বানর ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলো।

বালুচরে মরিচ, বেগুন, তরমুজ, শশার ক্ষেত। অনেকগুলো ক্ষেত। ক্ষেতের পর ক্ষেত। বাঘবন্দীর খেলার মতো আল দিয়ে ছক কাটা সবুজ সবুজ ক্ষেত। তরমুজ লতার লক লকে ডগাগুলো যেনো জলঢোঁড়া সাপের ফণা। সতেজ পাতাগুলো বাতাসে কাঁপছে, টলছে, খেলা করছে।

একটা ক্ষেতে খুউব বড়ো কালো একটা তরমুজ দেখে চারজনেরই জিভ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়লো। নিশ্চয়ই ভেতরটা পেকে একদম লাল হয়ে গেছে। চৌকি বসিয়েছে ক্ষেতের মালিক। মাচানে টঙ ঘরটির ওপরে বসে বসে গুড়ুক গুড়ুর হুঁকা টানছে আর বারবার তাদের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। তাদের মুখের লালা শুকিয়ে এলো। ভয়ে কচি বুকগুলো ঢিব ঢিব করতে থাকে। যদি জানতে পারে মালিক—তারা তরমুজ চুরি করতে চেয়েছিলো।

রেলওয়ের পুল, কক্সবাজারের বাস চলা রাস্তা সব কিছু পেছনে রেখে তারা বাড়ীর পাশের খালে এসে থামলো। খাল পেরিয়ে পুকুর পাড়ে এলো। একসঙ্গে পুকুরে নেমে মুখহাত ধুয়ে নিচ্ছে। ইতিমধ্যে জাফর পরনের প্যান্টটা খুলে ছুঁড়ে দিয়ে ঝুপ করে পানিতে নেমে পানি ছিটোতে লাগলো।

সিরাজ বললোঃ

- ভর ভর কালি সাঁঝে পুকুরে নামতে নেই। যখ আছে ধরবে উঠে আয় শীগগীর। জাফর জবাব দিলো ঃ

- আমি যখকে মোটেও ডরাইনে।

- ডরাসনে আচ্ছা।

যখ্ ও রাজা, যখ্ ও রাজা
পুকুরেতে ছেলে নামছে ধরে ধরে খা।

জাফর দু'হাতে পানি ছিটোতে থাকে। উঠবার নামও করে না।

- 'আব্বাকে ডাক দেবো? বললো সিরাজ।

- ইস্টিশানে গিয়েছিলে যে বলে দেবো।

- তুই যাসনি?

- আমাকেও তুমি ডেকে নিয়েছো বলবো।

- হুঁ। কোথায় গেছিলে জানতে পেরেছি। বলে দেবোই দেবো। আমাদের ফেলে যাবার মজা দেখাবো। বলতে বলতে কাঁঠাল গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো টুটু আর মনি। টুটু সিরাজের ছোটো ভাই। মনি তার বোন।

দহ্লিজের পাশে মার সঙ্গের দেখা। ডানপিঠে টুটু মার আঁচল ধরে বললো, 'কেমন বলে দিই'। ভয়ে সকলে মুখ শুকিয়ে গেলো।

হঠাৎ মা তাদের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন,- 'চুপচুপ গোলমাল করবি তো জ্যান্ত কবর দিয়ে ফেলবো। কচি বিলেত চলে গেছে। আজ চিঠি এসেছে। তোদের দাদী কাঁদছে। চেল্লাবি তো আস্ত রাখবো না।

ছেলেদের কচি কচি মুখগুলো কালো হয়ে গেলো। ঘরে এসে দেখে দাদী জায়নামাজের ওপর বসে কাঁদছে অঝোরে। চোখের পানির ফোটায় জায়নামাজ ভিজে গেছে। তসবীহ মালার মসৃন গোল পাথরের মতো দাদীর একেকটা চোখের পানির ফোটা টসটসিয়ে ঝরছে!

সে রাতে কেউ পড়তে বসলো না। আব্বাও ঘরে এসে কেমন যেনো গুম মেরে গেলেন। একটি কথাও বললেন না, ভাত খেলেন না। হুকার নলটা মুখে পুরে কি যেনো ভাবতে লাগলেন। সে রাতে মাস্টারকে চলে যেতে বললেন। শামসু, সিরাজ, জাফর এরাও চুপ মেরে গেছে। টুটুর ডানপিটেমি থেমে গেছে। মনি ছোটো ছোটো দু'চোখ মেলে কচি কাকুর বাঁধানো ছবিখানির দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু জাকারিয়া দাদীর জায়নামাজের পাশে পাশে ঘুর ঘুর করছে। এক সময় ছোট্ট দু'হাত দিয়ে দাদীর মুখখানি মুছিয়ে দিয়ে বললো, -'দাদী আমিও বিলেত যাবো। দেখবে, কচি কাকুকে ধরে নিয়ে

আসবো। চিঠি দেবো। চিঠি পেলে যেদিন আসবো হাশিমপুর ইস্টিশানে আনতে পাঠিয়ো। রাতের বেলা হলে টর্চবাতিটা দিও। আর যদি বৃষ্টি থাকে, একখানা ছাতা দিও সঙ্গে। কচি কাকু আবার বৃষ্টি সইতে পারে না, সর্দি হয়।

দাদী তাকে নীরবে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো। দাদীর বুকের ভেতর ডানা ভাঙ্গা কবুতরটার মতো কি একটা ঝটপট করছে শুনতে পেলো।

ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত বাতি জ্বললেও কেউ কোনো কথা বললো না। ওদের পড়বার ঘরের চৌকিগুলোতে দু'জন করে ঘুমিয়ে পড়লো। বাতি নিভেছে। বাইরে গাছের পাতারা ফিস ফিস আওয়াজ করছে। জাকারিয়া ঘুমুতে পারছে না।

সে ভাবছে বিলেতের কথা। নীল নোনা পানির ওপাড়ের দেশ। কেমন হবে দেখতে। গল্পের নীল কমল লাল কমলেরাও কখনো সে দেশে যায়নি। যেমন করে হোক সে বিলেত যাবে। যাবেই যাবে। গিয়ে চিঠি দেবে। কচিকাকুকে ধরে নিয়ে আসবে। হাশিমপুর ইস্টিশানে এসে গাড়ী থেকে নামবে। সকলে তাদের আনতে যাবে। ভাবতে কচি বুকখানা খুশীতে ভরে গেলো। অনেক রাতে ঘুমপরীরা তার দু'চোখের রাজ্যের ঘুম দিয়ে গেলো।

ঘুমের ঘোরে সে সমুদ্দুরের স্বপ্ন দেখলো। পানি। চারদিকে শুধু পানি। নীল নোনা পানি। গর্জন করছে। হুংকার ছাড়ছে। বিরাট পাহাড়ের মতো ঢেউ এসে একটা আরেকটার গায়ে আছরে পড়ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। সাদা সাদা ফেনার ফুল রোদ্দুরের ঝিকিমিকি জ্বলছে। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরছে। ঢেউয়ের চূড়ায় নেচে নেচে সোজা ছুটছে কলের জাহাজ। নারকোল গাছ শাখা দুলিয়ে বিদায় জানাচ্ছে। তরতর বেগে জাহাজ ছুটছে। পশ্চিমে সূর্যটা সমুদ্দুরের পানি রক্তের মতো রাঙিয়ে টুব করে ঝরে পড়লো। আকাশে তারা ফুটতে লাগলো রাত এলো। দু'পাশে বিকট ভয়াল হাঙ্গর কুমীরেরা ভেসে উঠলো। কি বিশ্রী হা। কেমন ধারালো দাঁত। জাকারিয়ার ভয় করতে লাগলো।

তার মনে পড়লো ভয় কিসের। তার সঙ্গে তো লাল কমল, নীল কমল আছে। সে একটি কক্ষের কড়া নেড়ে দু'ভাইকে গিয়ে খবর দিলো। নাঙা তলোয়ার হাতে দু'ভাই বেরিয়ে এলো। চাঁদের আলোর ছটায় তলোয়ার চিকমিক করতে থাকে। দু'ভাইকে দেখে হাঙ্গর কুমীরেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলো! বেশ মজা, হাত তালি দিয়ে উঠলো জাকারিয়া।

কার গলার আওয়াজে জাকারিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সকাল হয়েছে। সিরাজ কবিতা মুখস্থ করছেঃ-

'আমি সাগর পাড়ি দেবো ।